জুলাই 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

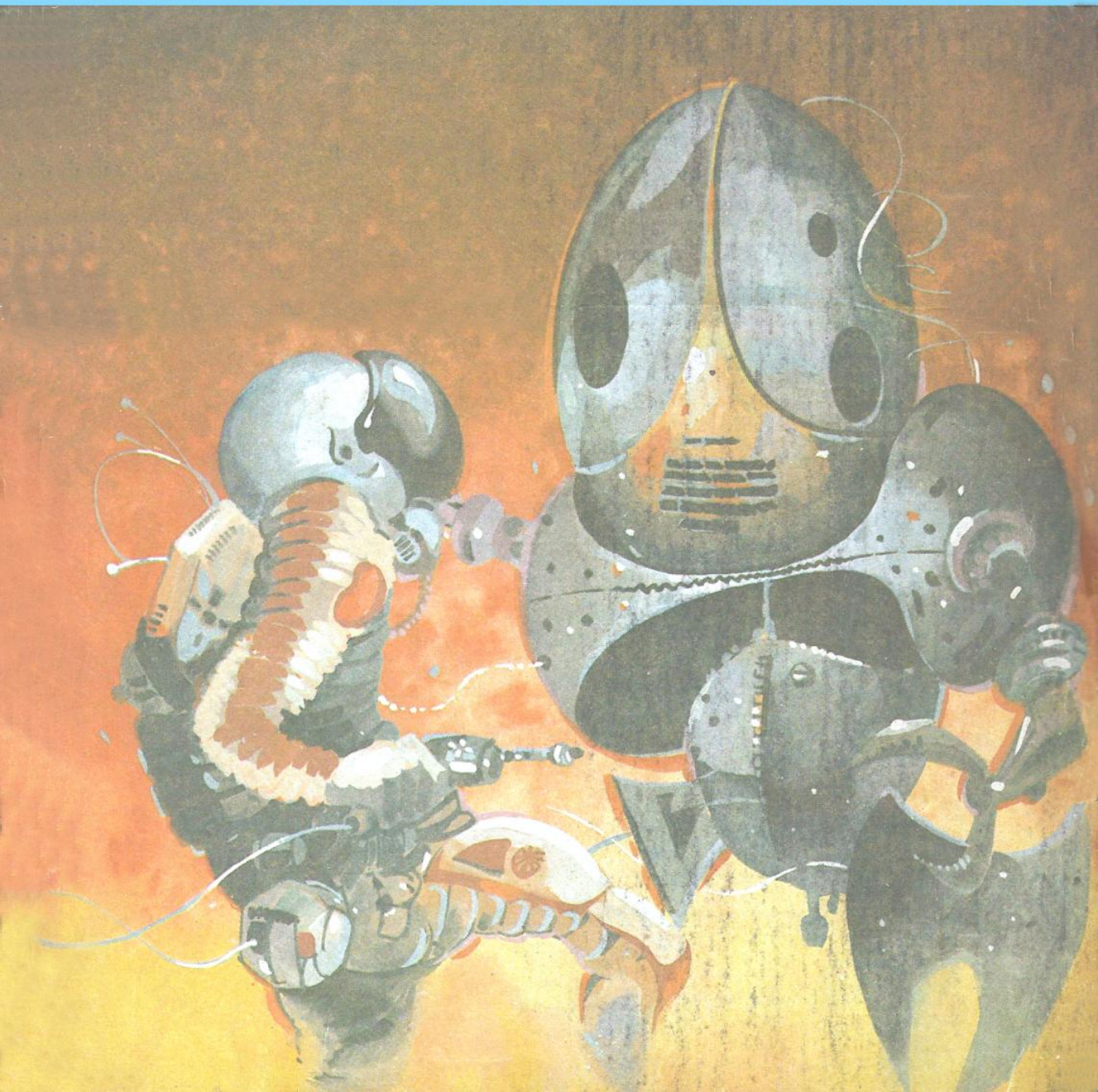

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

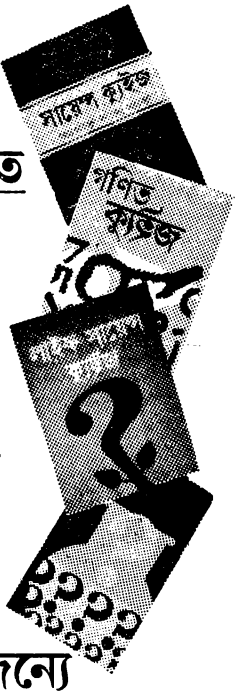

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
জুলাই, 1987

আগামী সংখ্যার
বিশেষ রচনা

ভিনগ্রহে কি বুদ্ধিমান
প্রাণী আছে ?

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহসম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4 **কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর :** হারানো পৃথিবীর সন্ধানে ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : একটি সত্যকাহিনী ॥ লুসিয়ান : অনুবাদ : শ্রীধর সেনাপতি 47 :.ক্যাসিওপিয়া ॥ শঙ্কর ঘটক 31

বিশেষ রচনা : অন্তর্দহন ইঞ্জিনের কথা ॥ সিদ্ধার্থ রায় 19 : স্ফীত চাল বানাবার যন্ত্র ॥ গবেষণা বিভাগ, আই আই টি 21

পড়াশোনা : লিথিয়াম ॥ অমরনাথ রায় 15 : জ্যামিতিক উপপাদ্যের অভিনব প্রমাণ ॥ অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় 17

জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা : জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 16 : বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 66 :

পরিবেশ ও আমরা : ভূমিকম্প ॥ উদয়ন ভট্টাচার্য 53

জীবজন্তু ও গাছপালা : কালোজাম ॥ রবীন্দ্রনাথ সর 30 ফিশ— অথচ মাছ নয় ॥ সন্দীপ সেন 40

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : ক্লায়োজেনিকস্ ॥ কে. এম. বাহারুল ইসলাম 18

ছড়া : বল কেন ॥ অরিজিৎ দত্ত 38

পৃথিবী ও সম্পদ : ভূ-গর্ভের তাপশক্তি ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 51

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান : হিমোডায়ালিসিস ॥ অশোক কুমার মাইতি 42

ইলেকট্রনিক্স এর কলাকৌশল : ইলেকট্রনিকস এর কথা ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 27 : মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 27

ধারাবাহিক রচনা : নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35 : বিজ্ঞানের ডায়েরী 'জুলাই ॥ বিমান বসু 63

আবিষ্কারের গল্প : এলিভেটর ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

ছবিতে গল্প : ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43 : প্রাণিবিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 : আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 : মুসাণ্ডা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 14 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : পরিষদের খবর ॥ 59 : সফল উত্তরদাতাদের নাম 50 : অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার 60 : কাকতাড়ুয়া ॥ রাজেশ গিরি 61 হাতছানিতে এল রঙ ॥ অপরাজিত বসু 62 : ক্যুইজ কনটেস্ট 1 2.3 ॥ 56

দুর্ঘটনার কারণ ॥ কমল কান্তি সেন 34 : শব্দকুট ॥ তাপস বেরা 57 : আই-কিউ টেস্ট 67 : সমাধান 57 : বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 9

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল

চিঠিপত্র

আইনস্টাইনের চিঠি

এপ্রিল '87 সংখ্যায় সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনস্টাইনের চিঠি রচনাটিতে কিছু তথ্যগত ভুল নজরে পড়ল। 30 পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন 1897 সালে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। বস্তুতঃ নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড 1911 সালে। গাইগার ও মার্সডেনের যৌথ গবেষণার ফলশ্রুতির ফলেই তা আবিষ্কৃত হয়েছিল। অবশ্য টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছিলেন 1897 সালে। পুনরায় জে. জে. টমসনকে লেখক ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটরীর প্রতিষ্ঠতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটরীর প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন ম্যাক্সওয়েল, যিনি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক সমীকরণের আবিষ্কারক। ম্যাক্সওয়েলের পর ডিরেক্টর হন লর্ড র‍্যালে। এবং লর্ড র‍্যালে অবসর গ্রহণের পর পরিচালনার দায়িত্ব জে জে. টমসনের উপরে বর্তায়। পুনরায় নীলস্ বোরের পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আবিষ্কারের দিন তারিখ নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। 1922 সালে নীলস্ বোর নোবেল সম্মানে সম্মানিত হলেও তিনি পরমাণুর গঠনতত্ত্ব আবিষ্কার করেন 1913 সালে। তাই '1922 সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত·· ···' লাইনটি বিভ্রান্তিকর। ছোটদের পত্রিকায় এ জাতীয় তথ্যগত ভুল থাকা উচিৎ নয় বলেই আপনার নজরে আনলাম।

ড. পি. মহান্তি, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আসাম 780 004.

এপ্রিল '87 সংখ্যায় আইনস্টাইনের চিঠি প্রবন্ধে লেখক সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক ডিমেক্রেটিসের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরমাণু জগতের জনক ডালটন সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। আবার ডিমেক্রেটিসের সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক কণাদ অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সরিৎবাবু তাঁর কথা বলেন নি কেন?

অপূর্ব কুমার পাল। গঙ্গারামপুর। পশ্চিম দিনাজপুর

চোরাবালি

মার্চ সংখ্যায় 'প্রশ্নোত্তর' পর্যায়ে 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে শ্রীসুধাংশু পাত্র যা বলেছেন তা যথাযথ নয় বলেই মনে করি।

'চোরাবালি' বালি ও জলের gel প্রকৃতির কলয়ডীয় দ্রবণ। আপাত-ভাবে যা দেখে কঠিন বলেই মনে হয়। কিন্তু gel এর thixotrophy বলে একটা অদ্ভুত ধর্ম আছে। ওই ধর্মের জন্য চাপ প্রয়োগ করলেই gel রূপান্তরিত হয় So/এ, So/3 কলয়েডীয় দ্রবণ। প্রকৃতিতে তরল। সুতরাং আপাত কঠিন চোরাবালির ওপর মানুষ বা কোনও জীবজন্তু এসে পড়লে চাপের প্রভাবে বালির gel তরল So/এ পরিবর্তিত হয়। মানুষ বা জীবজন্তু যতই চাপ দিয়ে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতে থাকে gelত তাই তরল So/এ পরিবর্ধিত হতে থাকে। ফলে মানুষ বা জীবজন্তু ক্রমশই গেঁথে যেতে থাকে বালির So/এ।

নীচে এ সম্বন্ধে দুটি সহজলভ্য ! eference দিলাম ঃ

(1) Rakshit ঃ Physical chemisty 4th Edition, P 709, Sarat Book House, Calcutta.

(2) Thixotrophy a Peculiar Property of gels, Science Reporter, Oct-Nov—1983. P. 60L.

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, বারসাত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়।

আগুনের কথা

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের গত এপ্রিল সংখ্যার (1987) 42 পাতায় সাধন কুমার গিরির 'আগুনের কথা' পড়ে উপকৃত হলাম। কিন্তু রচনাটিতে একটি ভুল রয়েছে। লেখা আছে, 'চাদরের মধ্য দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন টেনে নেয়। ফলে আগুন নিভে যায়। 'কিন্তু অক্সিজেন আগুনকে জ্বালাতে সাহায্য করে। অক্সিজেন টানলে আগুন নিভবে কি করে?

সৈকত চন্দ্র। রায়পাড়া। গুপ্তিপাড়া হুগলী।

1987-এর April-এর 'আগুনের কথা' নামক সাধন কুমার গিরির লেখা প্রবন্ধটি পড়লাম। উনি এক জায়গায় লিখেছেন যে 'কিন্তু সত্যি করে বলতো, টুকুনের প্রশ্নের মনের মত উত্তর কি তোমরাই দিতে পারবে?'

কিন্তু উনি নিজেই স্পষ্ট করে লেখেননি জল কেন আগুন নেভায়। কিন্তু এক জায়গায় লিখেছেন যে কাঠ ও মোম পুড়ে জল উৎপন্ন হয়। ছাইকে কি জ্বালানো যায়? জলও তো এক প্রকারের ছাই।

কিন্তু ওনাকে একটা কথা বলে রাখি যে, যে সমস্ত জিনিসে কার্বন আছে সেই সব জিনিসই কেবল পোড়ে। এবং যে জিনিসে কার্বন নাই তাহারা পোড়ে না, উপরন্তু আগুন নেভাতে সাহায্য করে। তাছাড়া জল যদিও অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সহযোগে গঠিত কিন্তু অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে ও হাইড্রোজেন জ্বলতে। কিন্তু জল যেহেতু যৌগ পদার্থ সেইহেতু O_2 ও H_2-এর কোন ধর্মই জলের মধ্যে থাকে না। তাই এই যৌগটি (H_2O) আগুন নেভাতে সাহায্য করে।

সুদীপ রঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম—খিদিরপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

সূর্য কি যুগল নক্ষত্র ?

আমি "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" এর নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার মার্চ-87 সংখ্যায় দেখলাম তন্ময় চৌধুরীর "সূর্য কি যুগল নক্ষত্র" (প্রশ্নোত্তর বিভাগ) প্রশ্নটির উত্তরটি সম্পূর্ণ নয়। আমি এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস্ ডেভিডসন এর মতে সূর্য নিঃসঙ্গ নক্ষত্র নয়। এর অদৃশ্য সহচরের নাম "লুসিফার"। (ডেভিডসনই এই নামকরণ করেন)। এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ 'আলোক আনয়নকারী'। এর ভর সূর্যের ভরের $\frac{1}{100}$ ভাগ হতে পারে আবার $\frac{1}{1000}$ ভাগও হতে পারে।

লুসিফারের অস্তিত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। তবে কয়েকটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে সূর্যও যুগল নক্ষত্র। ক্রিস ডেভিডসন বলেছেন, অনেক ধূমকেতুই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তারা যখন সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে যায় তখন সূর্য কিভাবে তাকে আবার টেনে আনে ? অবশ্য তার যদি একটি সঙ্গী থাকে তবে তা সম্ভব হবে। সে-ই ধূমকেতুটিকে সূর্যের দিকে টেনে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে আসে তখন তার কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়। ফলে তার ভর কমে যায়। দেখা গেছে ধূমকেতু যখন সৌরমণ্ডলের বাইরে গিয়ে আবার ফিরে আসে তখন তার ভর কমে যায়। হয়তো লুসিফারের কাছে যাওয়ার ফলেই তার ভর কমে যায়।

ভবিষ্যতে হয়তো বিজ্ঞানীরা উন্নত মহাকাশযান ব্যবহার করে এর সন্ধান দিতে পারবেন।

শ্রীশুভদীপ বেরা, গ্রাম+পোঃ—লাক্ষী, জেলা—মেদিনীপুর।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ক্যালেণ্ডার নিয়ে···

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মার্চ (1987) সংখ্যায় সুবীর চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা 'ক্যালেণ্ডার নিয়ে অঙ্কের মজা' প্রবন্ধে মজার একটা ভুল চোখে পড়ল। উদাঃ দেওয়া আছে $2\times20\times24=6720$ এবং $26\times10\times24=7280$। প্রথম ভুল $6\times10\times24$ এর গুণফল 6240, 7280 নয়; আবার উপরের বক্তব্য অনুযায়ী দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যাগুলো হতে হয় $26\times20\times14=7280$। গুণফল লেখার আগে কি গুণ করে দেখা হয় না ? কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো একটা পত্রিকায় এরূপ ভুল ছাপানো খুবই খারাপ দেখায়।

বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি যে 'পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হও' শীর্ষক একটা অংশ আগে এই পত্রিকায় ছাপা হতো। কিন্তু এখন আর সেটা ছাপা হচ্ছে না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ ঐ বিভাগটি পুনরায় চালু করুন। এর ফলে আমার মতো অনেক পাঠকই উপকৃত হবে/হবেন।

সন্দীপ কুমার ঘোষ
গ্রাম—কৈতাজ
পোঃ—আদড়াহাটি
জেলা—বর্ধমান।

বাংলা দেশে

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার গ্রাহক হবার ঠিকানা

সম্পাদক ঃ বিজ্ঞান বার্তা

পোস্ট বক্স ঃ 554 চট্টগ্রাম

ফোন ঃ 207987

জাতিঙ্গার পাখি

মহাশয়,

'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকদের মধ্য আমি একজন। প্রকাশিত মে '87 সংখ্যাটি মন দিয়ে পড়লাম। বেশ ভাল লাগল অজয় হোমের 'জাতিঙ্গার পাখি' প্রবন্ধটি। আর এই পত্রিকায় দুটি ভুল বিষয়ও খারাপ লাগল।

প্রথমটি সমীর মণ্ডলের 'বুদ্ধিশুদ্ধি'র জোর ধাক্কা'র সম্বন্ধে।

লেখক বলেছেন, দুটি জেট পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে যথাক্রমে 8 কিমি ও 12 কিমি বেগে (সময় নির্দিষ্ট নেই) চলেছে। তাহলে ধাক্কা লাগার 1 মিনিট পূর্বে তাদের মধ্যে দূরত্ব কত।

লেখক এর উত্তরে চট করে বলে দিলেন 20 কি. মি.। কিন্তু উত্তরটা কি ঠিক ?

লেখক যেহেতু বেগের সময় এর একক নির্দিষ্ট করে দেননি সেহেতু বেগের সংজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত এককেই ধরতে হবে।

বেগের সংজ্ঞা থেকে পাই, এক সেকেণ্ডে কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে যতটা পথ যেতে পারে তাহাই উহার বেগের পরিমাপ।

সংজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, জেট দুটি সেকেণ্ডে যথাক্রমে 8 কিমি ও 12 কিমি বেগে যাচ্ছিল। তাহতে 1 সেকেণ্ড আগে উহাদের মধ্য দূরত্ব হবে 20 কি. মি. ; এক মিনিট আগে নয়।

দ্বিতীয় ভুলটি দেখলাম 'বলতে পার কেন ?' বিভাগে একটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে।

প্রশ্নটি ছিল, উত্তর দিকে মাথা করে ঘুমুতে নেই কেন ? উত্তরে লেখক বলেছেন যে এটা একটা সংস্কার। কিন্তু সত্যই কি তাই ? মনে হয় তা নয়। বিজ্ঞান এই ঘটনা মেনে নিয়েছে।

মাদ্রাজে এই ঘটনা নিয়ে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, উত্তর দিকে মাথা করে শুলে মস্তিষ্কে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়।

আমার অনুরোধ এই বিষয়ে আপনারা অনুসন্ধান করুন এবং তা পরবর্তী কোন সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করুন।

ধন্যবাদান্তে

শ্রীপিণ্টু শীল

গাজিপুর, হাওড়া

নতুন ফিচার ও শুভেচ্ছা

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। দেখতে দেখতে 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের বয়স 7 বছরে পড়ল। নতুন বছরে 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' নতুন সাজে সেজেছে। মার্চ সংখ্যায় ইন্দ্রনীল ঘোষ ইউক্লিডের জ্যামিতিকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের সজাগ পাঠকেরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রনীল ঘোষ দশম শ্রেণীর ছাত্র হয়েও বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে এটা কম কথা নয়। এই ধরনের প্রয়াস প্রশংসনীয়। 'আবিষ্কারক কলম্বাস' নামে নতুন ফিচারটি ভালো হয়েছে।

'যোগে সুস্বাস্থ্য' বিভাগটি নতুন। এই বিভাগটি চালু রাখুন। ভালো হয়। 'বলতে পারো কেন ?' বিভাগটি আকর্ষণীয়।

ইতি

দিলীপ কুমার ঘোষ

পোঃ নেকরে, জেঃ পুরুলিয়া

পাঠকের অভিমত

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা আমাদের অতি প্রিয় পত্রিকা। এই পত্রিকার মান উন্নয়নে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব পাঠালাম। এগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি পড়লে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে এখন প্রায় সব সংখ্যাতেই 'নিজে নিজে কর'তে ইলেকট্রনিক্স মডেল থাকে। তাছাড়া একটি নিয়মিত ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট তো থাকেই। 'নিজে নিজে কর'তে অনেক সংখ্যায় একাধিক মডেল থাকে। অথচ আমর মনে হয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক গ্রাহকই এই মডেলগুলো তৈরি করতে পারে না। কারণ, মডেল খরচ লেখকদের ভাষায় যত 'অতি সামান্য'ই হোক না কেন ; প্রতিমাসে ঐ টাকাটা তাদের পক্ষে দেওয়ার সামর্থ্য তাদের থাকে না। ঐ মডেলগুলি কার দৈনন্দিন কাজে কত টুকু লাগে, কিংবা সর্বোপরি কতটুকু আনন্দ সেগুলো থেকে পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মডেল-গুলোতে ঠিক অভিনব সৃষ্টির আনন্দ আছে বলা ঠিক হবে না। কারণ model গুলো শুধুমাত্র কয়েকটা যন্ত্রপাতি কিনে জুড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানের সাধারণ ধর্মের উপর নির্ভর করে মজার মজার মডেল / খেলা বিভিন্ন লেখকদের দিয়ে লেখালে কি মন্দ হোত ? রসায়ন কিংবা জীববিদ্যার উপরও এগুলো করা যায়। যেমন বিভিন্নতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে। রসায়নের বিভিন্ন খেলা ছাড়াও দৈনন্দিন বিভিন্ন রাসায়নিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়াও তো দেওয়া যেতে পারে। তাতে থাকবে নতুন চিন্তাধারা ও অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন।

'জানা অজানা' বলে একটি নতুন ফিচার শুরু করলে ভালো হোত।

ইতি

—কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুরাগী পাঠকবৃন্দ।

হারানো পৃথিবীর সন্ধানে

সমরজিৎ কর

ভেনেজুয়েলার দক্ষিণে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিচিত্র এক পর্বতমালা। অজস্র চূড়া, আকাশ থেকে দেখলে মনে হয়, স্থলভাগের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটি দ্বীপ। যেন দ্বীপপুঞ্জ। পর্বতমালার উচ্চতা গড়ে এক মাইলের মত। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অ্যামাজন নদী। অ্যামাজন অধ্যুষিত এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে উষ্ণ বাষ্প এসে এলাকাটি সব সময় গুমোট করে রাখে। পর্বতমালার যে অংশটি সবচেয়ে বড়, সেটি অবস্থান করছে প্রায় 250 বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। দেখতে ঘোড়ার খুড়ের মত। নাম 'দে লা নেবালিনা'। যার ইংরেজি অর্থ 'কুয়াশার পর্বত'। এই অঞ্চলটির নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এখন খুবই উদ্বিগ্ন। বছর সাড়ে তিন হল, এখানকার প্রাণী এবং উদ্ভিদদের নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক অনুসন্ধান। পঁচিশটি গবেষণাগার থেকে কম করেও একশ পঁচিশ জন বিজ্ঞানী এক একটি অতিকায় হেলিকপ্টারে নেবলিনার সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো বিচরণ করছেন ছোট ছোট নৌকায়। সংগ্রহ করছেন এ অঞ্চলের বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদের নমুনা।

এই দলে রয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অভ্ ন্যাচারাল হিস্টোরির উপ-পরিচালক এবং বিশিষ্ট কীটবিশেষজ্ঞ জেরোম রোজেন। এখানকার ব্যাপারস্যাপার দেখে তিনি তো অবাক। কিছুদিন আগে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জনৈক সাংবাদিককে তিনি বলেন, সবুর করুন, আমরা অনেক নতুন কথা জানতে পারবো। আপাতত পৃথিবীর এই বিচিত্র অঞ্চলের নানা রকম প্রাণী এবং গাছপালা আমরা সংগ্রহ করছি। তারপর আমরা বোঝার চেষ্টা করবো, ওই অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আসল রহস্য। এর ফলে জৈবিক বিবর্তনের অনেক নতুন কথাও হয়ত আমরা জানতে পারবো।

এখানকার পর্বতমালা বেলে পাথরে তৈরি। এবং সব চেয়ে মজার ব্যাপার, এরা যে চিরকাল এখানে ছিল, তাও নয়। এখন যেখানে ইথিওপিয়া, সুদূর অতীতে সেখানকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে বয়ে আসত অজস্র নদী। তাদের জলধারা উঁচু এলাকা থেকে নিয়ে আসত বালি এবং মাটি। সেই বালি স্তরে স্তরে জমে তৈরি করেছিল বেলে পাথরের উপত্যকা। তখন আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা নামে কোন পৃথক পৃথক ভূখণ্ড ছিল না, যা ছিল তা অতিকায় একটি মহাদেশ—গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে গিয়ে এক সময় সৃষ্টি করে নতুন একটি ভূখণ্ড। সেই ভূখণ্ডটি ক্রমে সরতে সরতে চলে আসে পশ্চিম দিকে—তৈরি করে দক্ষিণ আমেরিকা। অবশিষ্ট খণ্ডটি আফ্রিকা নামে পরিচিত এখন। ভেনেজুয়েলার দ্বীপের মত পাহাড়গুলি ইথিওপিয়ার নদীবাহিত বালুর স্তর দিয়েই গঠিত হয়েছিল এক সময়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নেবলিনায় যে সমস্ত গাছপালা জন্মায় তাদের সঙ্গে আশপাশ অঞ্চলের তেমন কোন মিল

নেবলিনার বিরল উদ্ভিদ

নেই, বরং আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের গাছপালার সঙ্গেই

তাদের মিল অনেক বেশি। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা যখন সংযুক্ত ছিল—সুদূর সেই অতীতে—তখনো তারা বিরাজ করত। পরে দুটি ভূখণ্ড গেল বিভক্ত হয়ে। দক্ষিণ আমেরিকায় সেই গাছপালার পূর্বপুরুষরা ওই সময় চলে আসে। গত দশ কোটি বছরে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের আকৃতি এবং চরিত্রে দেখা দেয় পরিবর্তন। এখন যেমনটি দেখা যায়।

এ ছাড়াও পাওয়া গেছে আরো নানান প্রাণী এবং উদ্ভিদ। যেমন ধরো শুয়ো পোকা, যাদের রোঁয়া অপেক্ষাকৃত লম্বা, রঙ গাঢ় বেগুনী। পাওয়া গেছে, এক জাতের অতিকায় মাকড়শার মত প্রাণী। যাদের ইংরেজী নাম 'টারানটুলা'। পাওয়া গেছে হাতিচোকের মত গাছ। এখানকার নদী এবং দীঘিতে বাস করে কম করেও বারো জাতের 'ক্যাটফিস্'। যাদের এই ভূখণ্ডে আর কোথাও দেখা যায় না। এ ছাড়াও কয়েক জাতের পাখিও দেখা গেছে এই অঞ্চলে, যাদের চালচলন চেহারা অন্যান্য পাখির চেয়ে অনেক বেশি আলাদা। এখানে পতঙ্গভুক উদ্ভিদও দেখা যায়। যাদের মধ্যে অন্যতম কলসবৃক্ষ এবং ব্লাডারওয়ার্ট গাছের শেকড়ের অংশে থাকে খুদে খুদে দরজা। যারা ফাঁদের মত কাজ করে। পতঙ্গের সামান্য স্পর্শেই দরজার ভেতরের দিকে সৃষ্ট হয় 'ভ্যাকুয়াম'। অর্থাৎ বায়ুশূন্য অবস্থা। তখন পতঙ্গগুলি ভ্যাকুয়ামের টানে বেগে শেকড়ের গহ্বরে আকর্ষিত হয়। এই পতঙ্গভুক গাছগুলি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের পতঙ্গভুক্ গাছের চেয়ে স্বতন্ত্র। একমাত্র ইথিওপিয়া এবং আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলেই পাওয়া যায় তাদের। কোটি কোটি বছর ধরে তারা ভেনেজুয়েলার এই অঞ্চলে বাস করলেও, তাদের জীবনে বিবর্তনের স্পর্শ এসেছে অনেক ধীরে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পূর্বপুরুষরাও হয়ত এক সময় আফ্রিকাতেই বাস করত। তাদের অনেকে পাল্টালেও নেবলিনায় সে রকমটি দেখা যায় না। দীর্ঘ দশ কোটি বছরে পৃথিবীর বুকে ঘটেছে কত পরিবর্তন। অথচ তাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে কম। কেন এমনটি ঘটলো সেটা নিয়েই এখন গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনে ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

আই· সি· এ· 2656/87

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

ঊষা ও গোধূলির আকাশ লাল দেখায় কেন ?

ঊষা ও গোধূলির সময় সূর্যরশ্মিকে দিগন্ত থেকে তির্যকভাবে আসতে হয় বলে সুদীর্ঘ বায়ুস্তর অতিক্রম করতে হয়। বায়ুর স্তরগুলিতে অসংখ্য বস্তুকণা, ধূলিকণা ও জলকণা থাকে। ফলে উক্ত অবস্থায় সূর্যরশ্মিকে অধিক ঘন বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয় এবং প্রথম থেকে বেগুনী, নীল প্রভৃতি কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোগুলি পরপর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিক্ষিপ্ত লাল আলোটাই আমাদের চোখে পড়ে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

আকাশ কেন নীল ?

প্রশ্ন পাঠিয়েছে—1. তপনকুমার রায়, হলদিবাড়ী হাই স্কুল, কোচবিহার। 2. দেবরাজ পাল, বাকসাড়া, হাওড়া। 3. সোমা ব্যানার্জী, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। 4. সোমনাথ বটব্যাল, বাবুডুমরো হাই স্কুল, কর্তিয়া, মেদিনীপুর। 5. গোপাল মজুমদার, পাঁচবেড়িয়া, 24-পরগনা। মিতা, ঊষা ও কাঞ্চন, ফুলেশ্বর, হাওড়া।

প্রঃ ধ্রুবতারা সব সময় উত্তরে স্থির থাকে কেন ? 1. বিজয়কুমার সাউ, 56/20 ব্যানার্জী বাগান রোড, সালকিয়া হাওড়া। 2. সমীর কুমার হালদার, রাধাকান্ত নগর, জয়নগর, 24-পরগনা।

উঃ ধ্রুবতারাকে উত্তরদিকে সব সময় স্থির থাকতে দেখা যায় বটে, আসলে কিন্তু এটিও স্থির নয়। পৃথিবী অক্ষটা উত্তরদিকে ঐ ধ্রুবতারার দিকেই মুখ করে আছে। যেহেতু পৃথিবী অক্ষ স্থির নয় এবং খুব ধীর ও মন্থর গতিতে বৃত্ত রচনা করে চলেছে (অয়ন চলন)। সুমেরুর ঐ বৃত্তটা প্রদক্ষিণ করে আসতে প্রায় 26 হাজার বছর সময় লাগে। তার ফলে উত্তরদিকের লক্ষ্যস্থল অতি ধীর ও মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হয় এবং একটি নক্ষত্র বা নক্ষত্র-পুঞ্জকে কয়েক হাজার বছর ধরে স্থির থাকতে দেখা যায়। আজকে পৃথিবীর লক্ষ্যস্থল ধ্রুবতারা। হাজার কয়েক বছর পরে আসবে নক্ষত্রপুঞ্জ (শিবি)। পুনরায় ২৬ হাজার বছর পরে ঐ ধ্রুবতারাই হবে লক্ষ্যস্থল।

প্রঃ মানুষের মন কী ? আমরা কীভাবে মনের দ্বারা পরিচালিত হই এবং কেন ? নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, অশোকনগর, 24-পরগণা।

উঃ ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং এ সম্বন্ধে সেই প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত গবেষণা অব্যাহত আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, মানুষের মস্তিষ্কে যে অসংখ্য স্নায়ুকোষ আছে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের রূপটাই হচ্ছে মানবমন। পৃথিবীতে দুজন মানুষ দেখতে (সমকোষী যমজ ছাড়া) যেমন পুরোপুরি এক নয় তেমনই মনের দিক থেকেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

মানব মনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষগুলির 'উত্তেজিত' ও 'প্রশমিত'—এই গুণ দুটির মাত্রা ও গতিময়তার উপর। গুণ দুটি আবার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রগুলির সহজাত ক্রিয়া এবং উভয় গুণ পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। উত্তেজিত হলে মানুষকে নানাবিধ কাজকর্মে প্রবৃত্ত করায় এবং প্রশমিত হলে সংযত করায় বা কাজকর্ম করার স্পৃহাকে লুপ্ত করে দেয়।

গুণ দুটি আবার স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। অপর-দিকে বিভিন্ন মানুষের মনে গুণ দুটির মাত্রা ও শক্তি বিভিন্ন। কেউ সহজে উত্তেজিত হয় ও একটু পরে প্রশমিত হয়ে যায়, কেউ সহজে উত্তেজিত হয় না এবং উত্তেজিত হলে সহজে প্রশমিত হতে চায় না, ইত্যাদি। তাই সবার মানসিক ভাবধারা সমান নয়।

তবে এও সত্য যে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি সর্বদা প্রশমিত অবস্থায় থাকতে চায়। পরিবেশে কোন সমস্যা দেখা দিলেই প্রশমিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উত্তেজিত হতে থাকে এবং সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় থাকে। উত্তেজনা সহসা প্রশমিত না হলে মনের উপর চাপও পড়তে থাকে। যদি চাপ বেশি পড়ে তাহলে মন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। নানারকম শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর উৎসস্থল মস্তিষ্কে হাইপো-থ্যালমাস গ্রন্থি। আর এখানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেই নানারকম আবেগ, যথা— রাগ, ভয়, হিংসা, ক্ষোভ, লজ্জা, আনন্দ, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। মানুষকে বিভিন্ন কর্মে (ভাল ও খারাপ উভয়ই) প্রবৃত্ত করায় ঐ আবেগই। অবশ্য হাইপোথ্যালমাস গ্রন্থি ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন

কিছু ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা যদি প্রবল থেকে প্রবলতর হয় তাহলে হাইপোথ্যালমাস গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্পূর্ণ-রূপে হারিয়ে ফেলে এবং কতকগুলি হরমোনের নিঃসরণ ঘটায় তার ফলে মানুষ অনেক কুকর্মও করে এবং নানারকম অঘটনকে ডেকে আনে।

প্রঃ দুধের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খেতে হয় কেন? মণীন্দ্রলাল জানা, খালোড়, বাগনান, হাওড়া।

উঃ দুধের সঙ্গে চিনি না মিশিয়ে খাওয়াই ভাল। দুধেও আছে অনেক শর্করা, আর চিনি তো ঘনীভূত শর্করা—যার সঠিক মাত্রা নির্ণয় করা কষ্টকর। তাই এত শর্করার বাহুল্য না থাকাই ভাল।

প্রঃ হাতি কি গোটা বেল খেয়ে আস্ত খোসাটা পায়খানার সঙ্গে বার করে দেয়? রাজহাঁস কি জলমেশানো দুধ থেকে শুধু দুধটা খেয়ে নিতে পারে আর জলটা পড়ে থাকে? তাপস হালদার, নবীনচন্দ্র রোড, বারুইপুর।

উঃ দুটির কোনটিই ঠিক নয়। সংস্কৃতে 'গজভুক্ত কপিত্থ' কথাটা থেকে এই রকমের ধারণা। কপিত্থ বলতে কয়েত বেল এবং গজ বলতে এখানে হাতি নয়, এক ধরনের পোকা। অপর কথাটি পঞ্চতন্ত্রে বিষ্ণু শর্মা মূর্খ রাজপুত্রদের শিক্ষিত করা প্রসঙ্গে রাজাকে বলেছেন 'হংসৈর্যথা ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ।' কথাটির সাহিত্যমূল্য আছে কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

প্রঃ ডিমকে তেল মাখিয়ে রাখলে নষ্ট হতে দেরি হয় কথাটা কি ঠিক? অরূপকুমার দাস, অনুপকুমার দাস, পুরুষোত্তমপুর, এগরা, মেদিনীপুর।

উঃ ডিমের খোসার উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসাছিদ্র থাকে। তেল মাখিয়ে রাখলে ছিদ্রগুলি দিয়ে সাময়িকভাবে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটবে না। ফলে নষ্ট হতে বিলম্ব হবে।

প্রঃ বরফ খেলে কি পেট গরম হয়? বনানী সরকার, 47/1এ, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-4।

উঃ বরফের উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেড, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অতি ঠাণ্ডা বা অতি গরম কোন পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। এমন অবস্থায় শরীরের নানারকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং পাকস্থলীর দোষ ঘটায়। ঐ প্রতিক্রিয়াকে আমরা সাধারণত পেট গরম বলে থাকি।

প্রঃ 1. মানুষের স্বপ্ন দেখার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? সুশোভন মুখার্জী, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। 2. মাকড়সার জাল কি দিয়ে তৈরি? জয়দেব ও নবকুমার বর্মণ, নোনাকুড়ি, বল্লুক, মেদিনীপুর। 3. পাহাড়ে ফাটল সৃষ্টি হয় কেন? অমিয়কুমার পাল, বাঘাসন, মালডাঙা, বর্ধমান।

তোমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলি মাস কয়েকের ব্যবধানেই দেওয়া হয়েছে।

কালিন্দী, মেদিনীপুর।

প্রাণী বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

অস্ট্রিচের মতো কিছুটা দেখতে একটি পাখির নাম ক্যাসোয়ারী। এরা উটপাখির স্বজাতি। এরা অদ্ভুত কায়দায় মাছ ধরে খায়। এদের ডানাগুলো বড় বড়। তাই নিয়ে ওরা জলে নেমে ডানাগুলো জলে ডুবিয়ে দেয়। তারপর চুপচাপ স্থির হয়ে বসে থাকে।

ডানার ঝাপটায় মাছ পড়তে থাকে শুকনো মাটিতে আর ধড়ফড় করে। সেই সুযোগে ক্যাসোয়ারী একটি করে তুলে ডিনার খেতে থাকেন।

মাছেরা সী-উইড ভেবে ডানার পালকের মধ্যে ঢুকে নিশ্চিন্তে বসে থাকে।

তারপর ক্যাসোয়ারী হঠাৎ উঠেই একেবারে জল থেকে ডাঙায়।

KJB/JULY/87/3

ভূগোল যদি সত্যি হয় তবে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে মাটির পৃথিবী নিশ্চয়ই আছে। তার নাম এশিয়া —যার মুকুটমণি ভারতবর্ষ। স্থলপথে আজ সেখানে যাবার পথ বন্ধ। আরব যোদ্ধাদের দল বিধর্মী খ্রীস্টানদের সে পথে যেতে দেবে না। এখন একমাত্র পথ সমুদ্র।

অথচ আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব জলজন্তু আর ঝড়তুফানের রাজত্ব। মানুষ সেখানে হয়তো যেতে পারবে কিন্তু ফিরে আসতে কখনো পারবে না। আর পৃথিবী যদি একটা থালার মতো সমতল হয় তবে জাহাজ তার সীমারেখায় যখনি পৌঁছবে তখনি হারিয়ে যাবে অতল মহাশূন্যে।

কিশোরবেলার স্বপ্নের কাল কাটিয়ে এবার যুবক হয়ে উঠলেন ক্রিস্টোফার। ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তাঁর তরুণ শরীরের রক্তে মাতাল সমুদ্র। সুযোগের কোনও অপব্যবহার তিনি করলেন না। দীপ্তিমান পৌরুষ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন অজানার অভিযানে। খ্রীস্টাব্দ 1473। এসময়ই একদিন ডাক এলো এক জলযাত্রায়। গ্রীক দ্বীপ চিওসের পথে পাড়ি দিয়ে তিনি টায়রহিনিয়ান সাগর অতিক্রম করলেন। সামনে মেসিনা। সঙ্কীর্ণ এই প্রণালীটির পশ্চিমে সিসিলির দ্বীপভূমি। জাহাজ এখানে কয়েক দিনের জন্যে নোঙর করলো। আর কলম্বাস নেমে গেলেন বিশ্ব-

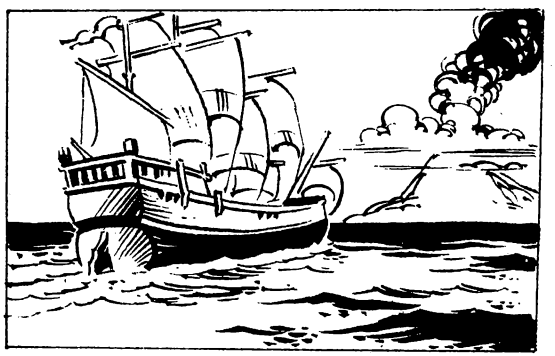

বিখ্যাত অগ্নিগিরি স্ট্রম্বোলির দুর্বার আকর্ষণে। একদিকে যখন মেসিনা প্রণালীতে আছাড় খেয়ে পড়ছে সাগরের জল, অন্যদিকে তখন হুংকার দিয়ে আকাশে লক লক করে উঠছে আগুনের শিখা। ধরিত্রীর জঠরদেশ থেকে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি যেন লাফ দিয়ে উঠছে মহাশূন্যের দিগ্বিজয়ে। দিনাবসানের আলোয় কী অপূর্ব মায়াময় দৃশ্য! পৃথিবী এতো সুন্দর, এমন রহস্যময়ী! আফ্রিকার দুস্তর মরুভূমির সীমাহীন হাহাকার কলম্বাস শুনেছেন। আটলান্টিকের উথাল-পাথাল তরঙ্গের কিছু পরিচয় স্বচক্ষে দেখেছেন। নিবিড় অরণ্যের সবুজে কী আশ্চর্য শান্তির অনুভব! ঝর্ণার কলগান তাঁকে উদ্বেলিত করেছে বারবার। পৃথিবী বহুরূপা। সাগরেরই বা কতো রূপ! গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের এক পাশে রয়েছে আয়োনিয়ান সাগর, অন্যপাশে ঈজিয়ান সাগর। বাণিজ্য-তরণীর দল এক সাগর থেকে আর এক সাগর, এক

দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপ, এক দেশ থেকে আর এক দেশ অতিক্রম করে চলে যায়। কিন্তু কতোদূর পর্যন্ত যেতে পারে? পৃথিবী যদি গোলাকার হয়, তবে ফিরে তো তাদের আসতেই হবে। ঠিক সেইখানে, যেখান থেকে এক দিন যাত্রা শুরু হয়েছিল।

চিওস থেকে ফিরে আসার পর ফ্লোরেন্সের পথে যাত্রা করলেন কলম্বাস। খ্রীস্টাব্দ 1474। সেখানে রয়েছেন এমন একজন মানুষ, যিনি বিশাল এই পৃথিবীর অনেক খবর তাঁকে দিতে পারেন। পাওলো টসানেলী। সারা ইউরোপে তাঁর নাম। বিশ্বতত্ত্ববিদ। এই মানুষটি আবার কলম্বাসের মতোই একজন নিপুণ চিত্রকর। তিনি তৈরি করেছেন এক মানচিত্র, যা পৃথিবীর রূপ সম্পর্কে তাঁকে সুস্পষ্ট একটা ধারণা যোগাতে সক্ষম।

সুদর্শন কলম্বাস টসানেলীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন তাঁর স্বপ্ন, তাঁর অভিযাত্রার আকাঙ্ক্ষা। নির্ভীক এই যুবকটির মাঝে আত্মসমাহিত টসানেলী খুঁজে পেলেন এক দুর্জয় পুরুষকারকে। হ্যাঁ, এ-ই পারবে। এমনি একজন মানুষই এর জন্যে দরকার।

টসানেলী তাঁর মানচিত্রখানির সামনে কলম্বাসকে নিয়ে গেলেন ঃ দেখো, এই হচ্ছে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। আটলান্টিকের পশ্চিমে এই যে ভূখণ্ড, এই এশিয়া। তুমি যদি পশ্চিমমুখে চলতে থাকো, তবে একদিন সেখানে পৌঁছবেই। হয় ক্যাথে (চীন), না হয় ভারতবর্ষ।

কিন্তু সাহস থাকলেই তো সব হয় না। চাই সঙ্গী, চাই সাহায্য। তুমি একা কতোটুকু করতে পারো ?

টসানেলী বললেন – আমার মনে হয়, পোর্তুগালে তোমার মনের মতো লোকের অভাব হবে না। সেখানকার রাজাও তোমাকে সাহায্য করতে পারেন।

কলম্বাসের ধারণা এবার দৃঢ়তর হোল। ইতিমধ্যে তিনি মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী পড়েছেন। পিয়ের দ্য এইলির মতে পৃথিবীর গঠনতত্ত্ব সবিস্তারে জেনেছেন। নিজের হাতে প্রতিলিপি করেছেন পাতার পর পাতা। মার্কো পোলোর বই লিখতে লিখতে বারবার তাঁর মনে হয়েছে—ক্যাথে কিংবা ভারতবর্ষ হয়তো হবে না, আটলান্টিকের পরপারে তাঁর অভিযানের সমাপ্তিতে তিনি যেখানে পৌঁছবেন, তার নাম চিপাংগু (জাপান)।

[চলবে]

মুসাণ্ডা

ফুল সবার প্রিয়। কোন ফুলের সৌরভ আছে। আবার কোন ফুল সৌরভহীন অথচ চোখ জুড়ান রূপ। বহুদূর থেকে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এই ধরনের ফুলের মধ্যে মুসাণ্ডা অন্যতম। তাই আজকাল অনেক বাড়ির বাগানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাগানে এই সৌখিন গাছটিকে দেখতে পাওয়া যায়। আর এই মুসাণ্ডার সৌন্দর্যের আভিজাত্যটুকু লুকিয়ে আছে তার মিষ্টি গোলাপী রঙের বিস্তৃতাকার বৃতিগুলির মধ্যে। গোলাপী রঙ ছাড়াও আরও দুটি রঙ হয়। সাদা ও

ফটো : সুব্রতকৃষ্ণ দে

লাল রঙ। বৃতির পাঁচটি বৃত্যংশই বিশালাকার হয়। সেগুলি পাঁপড়ির মত নরম, কোমল, ভেলভেটের মত হয়। অথচ প্রকৃত দলমণ্ডল বা পাঁপড়ি বৃতির তুলনায় আকৃতিতে নগণ্য। বড় বড় বৃতির মধ্যে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের দলমণ্ডল নাকছাবির মত জ্বল জ্বল করে। অনেকেই এই বৃতিকে ফুলের পাপড়ি বলে ভুল করে। বৃতির ওপর-তলের রঙ গোলাপী হলেও নিচের তল সালফার হলুদ রঙের হয়। শাখার প্রান্তে গুচ্ছাকারে ফুল শোভা বিস্তার করে। ফলে সবুজ গাছের ওপর গোলাপী রঙের বৃতির ঝাড় হয়ে থাকে। শুধু শীতকাল ছাড়া সারা বছরই ফুলের সমারোহ থাকে। এই সৌখিন বাহারী ফুল গাছটি আমাদের দেশের উদ্ভিদ নয়। এর নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইনে। কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে এর পরিচয় ছিল না।

এর বৈজ্ঞানিক নাম মুসাণ্ডা ফিলিপিকা। রুবিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত। ইংরাজীতে ফ্ল্যাগ বুশ, হিন্দিতে বেডনীয়া এবং বাংলাতে মুসাণ্ডা ও পত্রলেখা নামে পরিচিত। তবে মুসাণ্ডা নামটিই বেশি জনপ্রিয়।

এই ফুলগাছটি গুল্মজাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রায় 1·5 থেকে 3·5 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ঝোপ-ঝাড় যুক্ত হয়। পাতা সরল, অভিমুখ, উপপত্রযুক্ত, পাতার আকৃতি ডিম্বাকৃতি থেকে উপবৃত্তাকৃতি এবং শিরবিন্যাস স্পষ্ট। পাতার রঙ চকচকে সবুজ হয়। পাঁচটি বৃতিই বড় হয়। রঙ গোলাপী, সাদা ও লাল হয়। গোলাপী রঙের অনেকগুলি শেড হয়। দলনল চিড়ে ফেললে দেখা যাবে দলনলের গা প্রচুর রোমদ্বারা আবৃত। পাঁচটি পুংকেশর ও একটি গর্ভস্তবক বিদ্যমান।

এই বাহারী সৌখিন ফুলগাছটির বংশবিস্তার কাটিং এর সাহায্যে হয়। টবে বা বাগানের যে কোন ভাল মাটিতে হয়ে থাকে॥

——— এণাক্ষী বিশ্বাস

মৌলপরিচিতি ঃ লিথিয়াম

অমরনাথ রায়

পৃথিবীতে সবচেয়ে হালকা ধাতুটির নাম 'লিথিয়াম'। এটি পর্যায় সারণীর তিন নম্বর মৌল। এই ধাতুটির খনিজও দুর্লভ। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রেজিল দেশীয় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী J. ANDRADA E SILYA স্ক্যানডিনেভিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—নতুন নতুন খনিজ সংগ্রহ করে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করা।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাই তিনি নতুন দুটি খনিজের সন্ধান পেলেন। তারমধ্যে একটির নাম রাখলেন Petalite এবং অপরটির নাম দিলেন Spodumene. সুইডেনের Uto দ্বীপ থেকে তিনি ঐ খনিজ দু'টিকে সংগ্রহ করলেন। শীঘ্রই Spodumene খনিজটি আরও অনেক জায়গায় পাওয়া গেলো কিন্তু 1817 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত Petalite খনিজটি আর কোথাও মিললো না। দ্বিতীয়বার মিললো সেই Uto দ্বীপেই। কাজেই Spodumene খনিজটি নিয়েই প্রথম অনুসন্ধানকার্য শুরু হলো।

M. Klaproth ঐ খনিজটিকে বিশ্লেষণ করে তারমধ্যে অ্যালুমিনা এবং সিলিকার সন্ধান পেলেন। এক কথায় Spodumene হলো এক বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনো-সিলিকেট। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল যে বিশ্লেষিত পদার্থ দুটির ভর পরীক্ষার জন্যে গৃহীত আকরিকের ভরের তুলনায় 9·5% কম। Klaproth খনিজটির ভর হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর এক সহযোগী একটুখানি গুঁড়ো Spodumene আকরিককে নিয়ে বুনসেন বাতির শিখায় ধরে দেখলেন যে তা থেকে লাল রঙের শিখা নির্গত হচ্ছে। কেন ঐ লাল শিখা নির্গত হচ্ছে তা নিয়ে ঐ সহযোগী বিজ্ঞানী মাথা ঘামালেন না। আর সেইটাই হলো এক মস্ত বড় ভুল। নইলে Spodumene থেকে তিনিই এক নতুন মৌল আবিষ্কারে সক্ষম হতেন।

এরপর L. Vaquelin নামে জনৈক বিজ্ঞানী Petalite খনিজটিকে বিশ্লেষণ করে তাতে অ্যালুমিনা এবং সিলিকা ছাড়াও ক্ষারের অস্তিত্ব নিরূপণ করলেন। কিন্তু ক্ষারটি কি তা তিনি বলতে পারলেন না। জোহান আগস্ট আর্ফভেডসন (Johan August Arfvedson) নামে জনৈক সুইডিশ রসায়নবিদ 'পেটালাইট' নিয়ে এক বছর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে আকরিকটির 80% হলো সিলিকন অক্সাইড, 17% অ্যালমিনিয়ম এবং 3% হলো নতুন ক্ষারটি অর্থাৎ লিথিয়া (LiO_2)। ক্ষারটি যে একটি নতুন ক্ষারধাতু দিয়ে গড়া সে বিষয়ে আরফ্‌ভেডসন নিঃসন্দেহ হলেন এবং তাঁর শিক্ষক মহাশয় বার্জেলিয়াস এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তার নাম রাখলেন লিথিয়াম। পাথরের গ্রীক নাম Lithios থেকে 'লিথিয়াম' নামটি রাখা হলো।

আরফ্‌ভেডসন পেটালাইট খনিজ থেকে লিথিয়াম আবিষ্কারের একটি রিপোর্ট 1819 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করলেন, কিন্তু 1818 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই তিনি অন্যান্য খনিজে লিথিয়ামের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলেন। Klaproth যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, আরফ্‌ভেডসন তারও সমাধান করে দিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে Spodumene খনিজটিতে প্রায় 8% লিথিয়াম মৌলটি বর্তমান। এ ভিন্ন অনেকদিন যাবৎ মানুষের পরিচিত Lepidolite নামক খনিজটিতেও 4% লিথিয়াম আছে।—এমনিভাবে রসায়নের ইতিহাসে লিথিয়াম মৌলটির আবিষ্কর্তারূপে চিহ্নিত হলেন সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী আরফ্‌ভেডসন 1 17 খ্রীস্টাব্দে।

এরপর 1818 খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে হামফ্রি ডেভি সামান্য পরিমাণ লিথিয়াম, আকরিক থেকে নিষ্কাশনে সমর্থ হলেন। 1850 খ্রীস্টব্দের শেষার্ধে দুই জার্মান রসায়নবিদ্ বুনসেন এবং ম্যাটিসেন লিথিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্বারা লিথিয়াম ধাতুর পণ্যোৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।

যাক, এবার ইতিহাস ছেড়ে মৌলটির ধর্মের কথায় আসা যাক। লিথিয়ামের চিহ্ন হলো Li, পরমাণু ক্রমাংক হলো 3, পারমাণবিক গুরুত্ব = 6·939, গলনাংক 179°C এবং স্ফুটনাংক = 1340°C, ভূত্বকে মুক্ত অবস্থায় লিথিয়ামকে পাওয়া যায় না। ক্ষারীয় ধাতুর প্রথম সদস্য লিথিয়াম রজতশুভ্র মৌল। অনেকদিন ধরে বায়ুর

সংস্পর্শে থাকলে এই ধাতুটির ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। লিথিয়াম ধাতু সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের চেয়ে শক্ত কিন্তু সীসার চেয়ে নরম। সেই কারণে এই ধাতুটিকে পাতলা পাতে কিংবা সরু তারে পরিণত করা যায়। লিথিয়াম যেমন ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা, তেমনি সকল মৌলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপেক্ষিক তাপবিশিষ্ট মৌল। লিথিয়াম কার্বনেট যৌগটিকে ম্যাগনেসিয়াম সহযোগে উত্তপ্ত করলেও লিথিয়াম পাওয়া যায়। লিথিয়ামের অনেক যৌগ ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামে ঝাল দেবার কাজে ব্যবহৃত হয় লিথিয়াম ক্লোরাইড। লিথিয়ামের গ্রীজ এনামেল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অলৌহ ঢালাইয়ে 'লিথিয়াম' গ্যাস অপসারকরূপে, গন্ধক অপসারকরূপে এবং অক্সিজেন অপসারকরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার ভিটামিন-A সংশ্লেষণে লিথিয়াম অনুঘটকরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে (1) Chemical elements, how they were discovered—D.N. Trifonov and V.D. Trifonov. (2) একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ ঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

দিন দিন বিজ্ঞান লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে। এপার এবং ওপার—উভয় বাংলাতেই মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানসাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে, এটা একটা শুভ লক্ষণ। এপার বাংলার কথা ছেড়ে ওপার বাংলার কথাতেই আসি। আবদুল্লাহ আল-মুতী ওপার বাংলার একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞান লেখক। ইতিমধ্যেই তিনি খান বাইশ গ্রন্থ রচনা করেছেন যার অধিকাংশই বিজ্ঞান বিষয়ক। সম্প্রতি ঢাকার আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একখানি গ্রন্থ, যার নাম "প্রাণলোক ঃ নতুন দিগন্ত।" মূলতঃ এটি জীবন বিজ্ঞানের বই কিন্তু স্কুল বা কলেজের পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিকে লেখা নয়। প্রকৃতপক্ষেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে লিখেছেন, যথা জীবন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, জৈবপ্রযুক্তি। লক্ষণীয় এই যে প্রতিটি অধ্যায়ই অপর অধ্যায়গুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাছাড়া প্রতিটি অধ্যায়েই জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কালের অগ্রগতির কথা আলোচিত হয়েছে। মানুষ চায় দীর্ঘজীবী হয়ে বাঁচতে। সেই বাঁচারই অপর নাম জীবন। কিন্তু সেই জীবনেরই আছে বিস্তার, ছন্দ ও যন্ত্রণা। জীবনকে ভালভাবে উপভোগ করতে হলে দরকার সুস্বাস্থ্য। সে জন্যে চাই পুষ্টিকর খাদ্যসম্ভার। তাছাড়া দেহের যত্ন নেওয়া দরকার, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া দরকার। ক্যানসার এক মারত্মক ব্যাধি। যে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বলীয়ান হয়ে চাঁদের পিঠে নামা-ওঠা করছে ও এমনি আরও অনেক অসাধ্য সাধন করছে সেই মানুষ আজও ক্যানসার রোগের রহস্য ও সম্পূর্ণ নিরাময়ের পন্থা আবিষ্কার করতে পারেনি—এটা ভাবতেও অবাক লাগে। তবুও লেখক আশাবাদী। তাই লিখেছেন, "হয়তো এমন দিন বেশি দূরে নয় যখন এ সব গবেষণা থেকে ক্যানসারের রহস্য পুরোপুরি উদঘাটিত হবে; আর এর নিরাময়ের পন্থাও মানুষ আয়ত্ত করতে পারবে।" জৈববস্তু এবং জৈব-প্রযুক্তি অধ্যায় দু'টিতে লেখক খুবই চিত্তাকর্ষক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন, যথা জৈববস্তু থেকে জ্বালানি কচুরিপানা ঃ আপদ ও সম্পদ খড়ের নতুন ব্যবহার। সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়গুলি অনেক তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান দেবে। আর জৈব প্রযুক্তি শুধু যে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এনেছে স্বর্ণযুগ তা নয়, ফসল বিজ্ঞানেও এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে।

গ্রন্থখানি এমন সরল ও সাবলীল ভঙ্গিমায় লেখা যে একবার পড়তে শুরু করলে, ছেড়ে ওঠা দায় হয়। প্রচ্ছদ ছাপা মনোরম। গ্রন্থের শেষে বিষয়বস্তুর 'নির্ঘণ্ট' গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কিছু ছবি যদি ছাপা সম্ভব হতো তাহলে গ্রন্থখানি আরও চিত্তাকর্ষক হতো। এমন সুন্দর একখানি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই।

প্রাণলোক ঃ নতুন দিগন্ত
লেখক ঃ আবদুল্লাহ্ আল-মুতী
প্রকাশক ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস
ঢাকা—১, বাংলা দেশ। মূল্য—চল্লিশ টাকা।

জ্যামিতিক উপপাদ্যের অভিনব প্রমাণ

অসীম মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য উপপাদ্যটি হল ঃ ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডকগুলি সমবিন্দু।

প্রচলিত প্রমাণে যে কোনো দুটি কোণের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় আঁকা হয় এবং বাকি কোণের শীর্ষবিন্দুর সঙ্গে উক্ত সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের ছেদবিন্দু যুক্ত করে দেখানো হয় যে এই রেখাটিও বাকি কোণটির অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক।

নতুন প্রমাণে তিনটি কোণেরই সমদ্বিখণ্ডক আঁকা হবে এবং কল্পনা করা হবে যে এগুলি সমবিন্দু নয়। এই অবস্থায় স্পষ্টতঃই দুটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক অপর কোণের সমদ্বিখণ্ডককে দুটি বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করবে। উপপাদ্যটি প্রমাণের জন্য দেখানো হবে যে এই দুটি ছেদবিন্দু অভিন্ন।

উপরিউক্ত কৌশলে বর্তমান লেখকের সমবিন্দু সংক্রান্ত দুটি উপপাদ্যের প্রমাণ আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্বত্রয় সমবিন্দু—এই উপপাদ্যটি Science Reporter পত্রিকার October '84 সংখ্যায় (পৃঃ 636) প্রকাশিত হয় এবং ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু, এই উপপাদ্যটির প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে Mathematics Today (কার্যালয় H-2A, Green Park Extension, New Delhi-16) পত্রিকার October '86 সংখ্যায় (পৃঃ 60)।

আলোচ্য উপপাদ্যের নতুন প্রমাণের জন্য একটি সহায়ক উপপাদ্যের প্রয়োজন হবে, সেটি উল্লিখিত হল—

সহায়ক উপপাদ্য ঃ ত্রিভুজের কোনো এক কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক ঐ কোণের বিপরীত বাহুকে উক্ত কোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাতে অন্তঃস্থভাবে বিভক্ত করে।

এই উপপাদ্যটি মাধ্যমিক অতিরিক্ত গণিতের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে, তাই এটির প্রমাণ অতিরিক্ত গণিতের নবম শ্রেণীর যে কোনো পাঠ্য পুস্তকে বা H. S. Hall এবং F. H. Stevens-এর A School Geometry (Parts I—V) পুস্তকের 256 পৃষ্ঠায় (Theorem 61 [Euclid VI. 3 and A]) পাওয়া যাবে, তথাপি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এটির প্রমাণ এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত হল।

সহায়ক উপপাদ্যের প্রমাণ ঃ

মনে করি (চিত্র-1) ABC ত্রিভুজের A কোণের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডক AD, A কোণের বিপরীত বাহু BC-কে D বিন্দুতে ছেদ করে, অর্থাৎ $\angle BAD = \angle DAC = A/2$; প্রমাণ করতে হবে, AB ঃ AC = BD ঃ CD

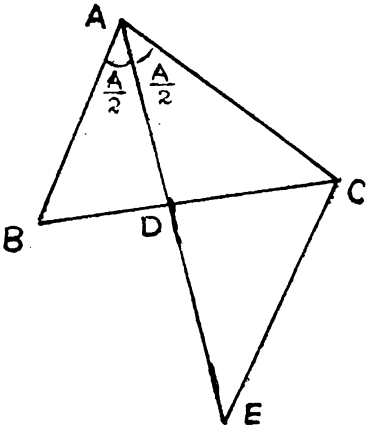

চিত্র - 1

AD-কে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হল, যাতে CE = AC হয়, তাহলে $\angle CEA = A/2$ এখন $\triangle ABD$ এবং $\triangle DEC$-এর মধ্যে

$\angle BAD = \angle DEC$, অঙ্কনানুসারে

$\angle ADB = \angle CDE$, বিপ্রতীপ কোণ

এবং $\angle ABD = \angle DCE$, অবশিষ্ট কোণ

অতএব $\triangle ABD$ এবং $\triangle ECD$ সদৃশকোণী,

সুতরাং AB ঃ EC = BD ঃ CD

বা, AB ঃ AC = BD ঃ CD ($\because$ EC = AC)

মূল উপপাদ্যের নতুন প্রমাণ ঃ

মনে করি (চিত্র-2) ABC ত্রিভুজের A কোণের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহু BC-কে D বিন্দুতে ছেদ করে এবং B ও C কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় A কোণের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডক AD-কে যথাক্রমে L ও M বিন্দুতে ছেদ করে। স্পষ্টতঃই L ও M বিন্দুদ্বয় AD রেখাস্থ D বিন্দুর একই পার্শ্বে অবস্থিত।

উল্লেখ্য, ত্রিভুজের কোনো দুটি কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় সমান্তরাল হতে পারে না, কারণ যদি মনে করা যায় যে AD এবং BL সমান্তরাল, তাহলে দেখানো যাবে যে $\frac{A}{2}+\frac{B}{2}=180^\circ$ বা, $A+B=360^\circ$ যেটি অসম্ভব, কারণ $A+B+C=180^\circ$

এখন $\triangle ABC$-র A কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক AD, অতএব সহায়ক উপপাদ্য অনুসারে

$$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD} \quad \text{বা, } AB.CD=AC.BD \quad \cdots(1)$$

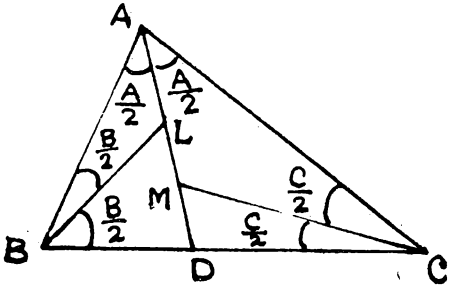

চিত্র - 2

অনুরূপভাবে $\triangle ABD$ এবং $\triangle ACD$-র B এবং C কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে BL এবং CM হওয়ায়

$$AB.DL=BD.AL=BD(AD-DL)$$

বা, $(AB+BD)DL=BD.AD$

বা, $$DL=\frac{BD.AD}{AB+BD}$$

এবং $$AC.DM=CD.AM=CD(AD-DM)$$

বা, $$DM=\frac{CD.AD}{AC+CD}$$

$$DL-DM=\frac{BD.AD}{AB+BD}-\frac{CD.AD}{AC+CD}$$

$$=\frac{AD(BD.AC-AB.CD)}{(AB+BD)(AC+CD)}$$

$=0$, 1-এর সাহায্যে

বা, $DL=DM$

AD রেখাস্থ L এবং M বিন্দুদ্বয় D বিন্দুর একই পার্শ্বে অবস্থান করায় $L=M$ অর্থাৎ L এবং M বিন্দুদ্বয় অভিন্ন। এই অভিন্নতাই প্রতিপাদন করে ABC ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অন্তঃ সমদ্বিখণ্ডক তিনটি অর্থাৎ AD, BL এবং CM সমবিন্দু।

অতএব যে কোনো ত্রিভুজের কোণত্রয়ের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকগুলি সমবিন্দু।

28/4/2/1B, শ্রীমোহন লেন, কল-26

ক্রায়োজেনিকস্

কে. এম বাহারুল ইসলাম

বিজ্ঞানের নবীন শাখাগুলির মধ্যে ক্রায়োজেনিকস অন্যতম। বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিজ্ঞানের উদ্ভব। 'ক্রায়োজেনিকস্' শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ হলো—'ঠাণ্ডার উৎপাদন'। খুব কম উষ্ণতায় উৎপাদিত পদার্থ এবং তাহাদের ভৌতিক ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা তথা গবেষণার নাম ক্রায়োজেনিকস্। এক কথায় যে বিজ্ঞান খুব কম উষ্ণতায় উৎপাদিত বস্তু, তাদের পরিচালনা এবং কার্যকারিতা নিয়ে কাজ করে তার নাম 'ক্রায়োজেনিকস্'।

ক্রায়োজেনিকস্ এ খুব কম উষ্ণতা বুঝাতে—150° C এর নীচে বুঝায়। প্রায় সব পদার্থই ঠাণ্ডায় জমে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু হিলিয়াম তরলই থেকে যায়। রবার জমে এমন ভঙ্গুর হয়ে যায় যে কাঁচের মত ভাঙ্গা যায়। এই সবই শূন্য ডিগ্রীর (Abs Zero) প্রায় 10 পয়েণ্ট উপরে ঘটে।

ক্রায়োজেনিকস্ এর এক আশ্চর্য ঘটনা হলো অতিতরলত্ব (Super fluidity)। যদি তরল হিলিয়াম একটি দুই কক্ষবিশিষ্ট পাত্রে রাখা যায়, তবে দেখা যায় যে কঠিন বিভাজকের মধ্য দিয়েও হিলিয়াম গলে গিয়ে দুই কক্ষের সমতা বজায় রেখেছে।

ক্রায়োজেনিকস্ এর আর একটি কার্য হলো অতিপরিবাহিতা (Super coductivity) অতিপরিবাহিতা আবিষ্কার করেন ডাঃ কামারলিং 1911 সালে, যাকে পরে হিলিয়াম তরলীকৃত করার জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় (1913)। যাই হোক 1957 সালে পরীক্ষামূলক ভাবে অতিপরিবাহিতা সূত্র গ্রহণ করা হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডঃ জন বারডিন ও তার সহযোগিগণ 1957 সনে প্রথম অতিপরিবাহিতা সূত্র প্রকাশ করেন। সূত্রটি বলবিদ্যার (Mechanics) উপর ভিত্তি করে লিখিত এবং খুবই প্রযুক্তি-বিদ্যাগত। প্রায় 300 বস্তু—25টি পদার্থে এবং বাকী খাদ ও মৌল এখন পর্যন্ত অতি পরিবাহী হিসাবে জানা গেছে। অতিপরিবাহিতার প্রয়োগ (শূন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা) পাওয়ার গ্রিড সমূহের নির্ভরশীলতা, ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ভারও অনেকটা লাঘব করেছে।

ক্রায়োজেনিকসের আরও অনেক প্রয়োগ আছে। যেমন, তরল নাইট্রোজেন দ্বারা দ্রুত জমিয়ে খাবারের স্বাদ তথা পৌস্টিক মূল্য অনেক বাড়ানো যায়।

যেহেতু ক্রায়োজেনিক পদ্ধতিতে জমানো এবং অনেক কম খরচে হয় তাই এই পদ্ধতি খাদ্যবস্তু তথা শাকসব্জী পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা অনেক সহজ হয়।

মোদ্দা কথা বর্তমান পৃথিবীতে ক্রায়োজেনিকস্ এর অবদান অনেক।

প্রযত্নে মহঃ এফ্ ইসলাম C/o. প্রিন্সিপাল আলো রুরাল কলেজ, বেনেনগা, সিলচর-5 আসাম।

অন্তর্দহন ইঞ্জিনের কথা

সিদ্ধার্থ রায়

পথের অগুনতি মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল, বাস ও লরি, সাগরে জাহাজ, আকাশে বিমান, মাঠে ঘাটে চাষের জন্য পাম্প, অন্ধকারের কলকাতায় দোকানে দোকানে জেনারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রকে চালাচ্ছে কে অর্থাৎ শক্তি যোগাচ্ছে কে, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলতে পারব 'ইঞ্জিন'। কিন্তু বহুল ব্যবহৃত এই ইঞ্জিনগুলো কি ধরনের, অথবা ইঞ্জিন কতরকমের হয়, কেমন ভাবে চলে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এগুলোই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়।

উপরে যেসব ইঞ্জিনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই এক বিশেষ গোত্রের, যার নাম অন্তর্দহন (internal combustion) ইঞ্জিন। এই গোত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল শক্তির উৎস রাসায়নিক জ্বালানিকে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরেই দহন করান হয়। অন্য ধরনের ইঞ্জিনে, যেমন বাষ্পীয় (steam) ইঞ্জিনে শক্তির উৎস বাষ্পকে ইঞ্জিনের বাইরে বয়লারে তৈরি করে তবে ইঞ্জিনে প্রবেশ করান হয়। ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে জ্বলানি এবং বায়ুর মিশ্রণে দহন ঘটলে দাহ্য গ্যাসের প্রসারণ ইঞ্জিনকে শক্তি যোগায়। জ্বালানির দহনজাত তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এই ইঞ্জিনের সাহায্যে। এখানে জেনে নেওয়া ভালো যে ইঞ্জিন বলতে এমন একটা যন্ত্র বোঝায় যার কাজই হল বিভিন্ন ধরনের সঞ্চিত শক্তিকে কাজের উপযুক্ত যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। তাপ শক্তিকে রূপান্তরিত করার ইঞ্জিনকে বলে তাপ-ইঞ্জিন (heat engine)। অন্তর্দহন ইঞ্জিনও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতই এক ধরনের তাপ-ইঞ্জিন।

অন্তর্দহন ইঞ্জিনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ রেসিপ্রোকেটিং (reciprocating) যেমন পেট্রল বা ডিজেল ইঞ্জিন, রোটারি (rotary) ইঞ্জিন যেমন গ্যাস টারবাইন, টার্বোজেট, ওয়াংকেল (wankel) ইত্যাদি ; নন-টারবাইন জেট ইঞ্জিন এবং রকেট ইঞ্জিন যেগুলি প্রতিক্রিয়া কার্যনীতিতে চলে। গ্যাস টারবাইন সাধারণতঃ বিদ্যুৎ তৈরির জন্য অল্টারনেটর / জেনারেটর চালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। টার্বোজেট বিমানের প্রপেলর চালায়। ওয়াংকেল ইঞ্জিন হল ছোট মাপের উচ্চ কার্যকারিতা সম্পন্ন রোটারি ইঞ্জিন কিন্তু এখন অবধি এগুলি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হবার মত পর্যায়ে আসেনি। জেট ইঞ্জিন এবং রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় আধুনিক জেট বিমান এবং রকেট চালনার কাজে। বর্তমান রচনায় মূলতঃ রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পথে ঘাটে মাঠে আমরা এই জাতীয় ইঞ্জিনগুলিই দেখতে পাই।

রেসিপ্রোকেটিং অন্তর্দহন ইঞ্জিনের জনপ্রিয়তার এবং বহুল ব্যবহারের মূল কারণ এদের কার্যকারিতা (যা অন্তর্দহন ইঞ্জিনেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য) অপেক্ষাকৃত হালকা ওজন, সহজে চালান যায় এবং ছোট-বড় নানা মাপের ইঞ্জিন স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ করা সম্ভব। এই সব কারণেই একদিকে যেমন এর নূতন ব্যবহার ঘটেছে অপরদিকে বহু ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে এ প্রতিস্থাপিত করছে।

এবার দেখা যাক অন্তর্দহন ইঞ্জিনের উচ্চ কার্যকারিতার রহস্যটি কি। এর মূল কারণ উচ্চ চাপে জ্বালানির দহন। 1862 খৃস্টাব্দে আলফন্স ব্য দা রোশা উচ্চ চাপে জ্বালানির দহন দক্ষতা এবং উচ্চ প্রসারণ হারের (expansion ratio) মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং চার স্ট্রোক সাইকল্ (four stroke cycle) বিশিষ্ট পিস্টন ইঞ্জিনে এরকম ঘটানো সম্ভব বলে মত দেন। রোশার বক্তব্যের সূত্র ধরে 1876 খৃস্টাব্দে এন. এ. অটো সর্বপ্রথম এই ধরনের একটি কার্যক্ষম ইঞ্জিন তৈরি করে যা অটো ইঞ্জিন নামে বিখ্যাত।

ইঞ্জিনের মূল অংশ হল একটি সিলিণ্ডার এবং একটি পিস্টন (Piston)। সিলিণ্ডারটি সঙ্কর ধাতুর তৈরি একটি ফাঁপা বেলন যার একদিক ঢাকা এবং অন্যদিক খোলা। খুব সোজা করে বললে যেন একটা বৃত্তাকার কৌটা যার ঢাকনাটি নেই। পিস্টনটি অ্যালুমিনিয়ামের ধাতু সঙ্কর দিয়ে তৈরি বেলনাকার। যার ব্যাস সিলিণ্ডারের অন্তঃস্থ ব্যাসের সমান। সিলিণ্ডারের যে দিকটি বন্ধ থাকে তাকে বলে সিলিণ্ডার হেড। সিলিণ্ডার হেডে দুটি ছিদ্র থাকে যা স্প্রিং-এর চাপে দুটি ভাল্ভের (valve) সাহায্যে বন্ধ রাখা হয়। ইঞ্জিন কাজ করলে পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে চলাচল করতে থাকে। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি পিস্টনের চলকে একটি স্ট্রোক বলে। চিত্রে ফোর স্ট্রোক অটো ইঞ্জিনের বিভিন্ন স্ট্রোক এবং সেই সাথে ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী দেখান হয়েছে। ইঞ্জিনের প্রথম স্ট্রোকটিকে বলে অন্তর্গ্রহণ (intake) স্ট্রোক। পিস্টনটি সিলিণ্ডার হেডের দিক থেকে অপর প্রান্ত অবধি গেলে এই স্ট্রোকটি শেষ হয়। এই সময়ে সিলিণ্ডারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়

তার সুবাদে হাওয়া এবং জ্বালানির মিশ্রণ একটি ভাল্ভ ছিদ্র দিয়ে সিলিণ্ডারে ঢোকান হয়। দ্বিতীয় সংনমন (compression) স্ট্রোকটি মিশ্রণকে সংনমিত করে। সংনমনের ফলে মিশ্রণটির চাপ এবং একই সাথে উষ্ণতাও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় মিশ্রণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগিয়ে জ্বালানির দহন ঘটান হয়। দ্রুত দহনের ফলে দাহ্য পদার্থের চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং সেই চাপে পিস্টনটি ফের বাইরের দিকে চলতে থাকে। এটিই ইঞ্জিনের তৃতীয় প্রসারণ (expansion) বা ক্ষমতা (power) স্ট্রোক। স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয় সিলিণ্ডার হেডে বসান স্পার্ক প্লাগে উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠিয়ে। তৃতীয় স্ট্রোকের শেষে ইঞ্জিনের অপর ছিদ্রটিকে খুলে দেওয়া হয় এবং চতুর্থ নিষ্কাশন (exhaust) স্ট্রোকটি দাহ্য পদার্থকে ঐ ছিদ্র দিয়ে ইঞ্জিনের বাইরে বের করে দেয়। এর পর আবার শুরু হয় সেই প্রথম স্ট্রোক থেকে। চারটি স্ট্রোকের মধ্যে কেবল তৃতীয়টিতেই শক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এমন পরিমাণে যে তার সাহায্যেই বাকি তিনটি স্ট্রোক চালিয়েও কিছু বাড়তি থাকে কাজে লাগানর জন্য।

দহনজাত উচ্চ চাপে পিস্টনটি ধাক্কা খেয়ে চলাচল করতে আরম্ভ করে কিন্তু সিলিণ্ডার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে না। তার কারণ পিস্টনটি কানেক্টিং রডের মাধ্যমে বাঁধা থাকে ক্র্যাঙ্কশাফ্টের সাথে। ক্র্যাঙ্কশাফ্টটি ইঞ্জিনের কাঠামোর (ক্র্যাঙ্ককেস) দুদিকে দুটি বিয়ারিং-এর উপর ধরা থাকে, এবং এর একদিক ইঞ্জিনের বাইরে বেরিয়ে থাকে। কানেক্টিং রড ক্র্যাঙ্কশাফ্ট এমন একটি মেকানিজম যে পিস্টনের রেসিপ্রোকেটিং গতির সাথে সাথে ক্র্যাঙ্কশাফ্টটি ঘুরতে শুরু করে। পিস্টনের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য, ক্র্যাঙ্কবৃত্তের ব্যাসের সমান। ক্র্যাঙ্কের অর্দ্ধ আবর্তন পিস্টনের একটি স্ট্রোক, অর্থাৎ এই অর্দ্ধ আবর্তনে পিস্টন যে দিকে চলে, ক্র্যাঙ্কের পরের অর্দ্ধ আবর্তনে পিস্টনটি উল্টো দিকে চলে। ক্র্যাঙ্কশাফটের মাধ্যমেই ইঞ্জিনের শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসে।

এই জাতীয় ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে সাধারণতঃ পেট্রল ব্যবহার করা হয়। স্পার্কের সাহায্যে দহন শুরু করা হয় বলে একে স্পার্ক ইগ্নিশন (SI) ইঞ্জিনও বলে। এই ইঞ্জিনগুলি প্রধানতঃ মোটরগাড়ি চালাতে ব্যবহার করা হয়।

মূল যন্ত্রাংশ ছাড়াও আনুষঙ্গিক কয়েকটি যন্ত্রাংশ বা ব্যবস্থা রাখা হয় একটা ইঞ্জিনে। ইঞ্জিন চালু করার জন্য ক্র্যাঙ্কশাফটকে ঘোরান হয় একটি হাতল দিয়ে অথবা ব্যাটারির শক্তি দিয়ে একটা অল্টারনেটরকে মোটর হিসাবে চালিয়ে। দ্বিতীয় এই ব্যবস্থাকে বলে সেল্ফ স্টার্টিং। ইঞ্জিনের উষ্ণতা কম রাখার জন্য কাঠামোর মধ্যে দিয়ে জল অথবা ইঞ্জিনের উপর দিয়ে হাওয়া প্রবাহিত করা হয়। ঠিক সময়ে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে ডিস্ট্রিবিউটর নামক একটি যন্ত্র। ইঞ্জিনের ভাল্ভগুলি খোলা হয় ক্যামশাফট

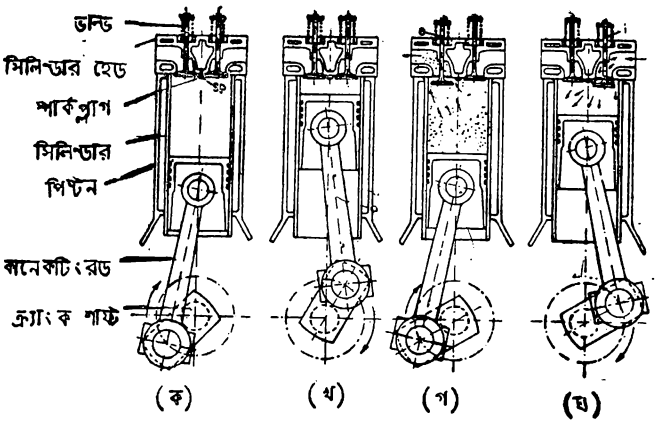

চিত্র : চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের স্ট্রোকগুলি।
(ক) নিষ্কাশন (খ) অন্তর্গ্রহন (গ) সংনমন
(ঘ) প্রসারণ বা ক্ষমতা

এবং ক্যামফলোয়ার মেকানিজম দিয়ে। জ্বালানি এবং হাওয়ার অনুপাত দরকার মত পরিবর্তন করা যায় কার্বুরেটরের সাহায্যে।

অটো কর্তৃক চার-স্ট্রোক ইঞ্জিন তৈরির দু বছরের মধ্যে স্যার ডুগাল্ড ক্লার্ক দুই-স্ট্রোকের ইঞ্জিন তৈরি করেন যার ক্র্যাঙ্কশাফটের এক আবর্তনেই দহন চক্রটি সম্পূর্ণ হয়। এই ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের গাত্রদেশে দুটি নিষ্কাশন ছিদ্র থাকে যা ভাল্ভের বদলে পিস্টনের অবস্থানের উপর নির্ভর করেই খোলা বা বন্ধ থাকে। এই ইঞ্জিনের জ্বালানি খরচ একটু বেশি হলেও এর হালকা ওজনের জন্য মোটর সাইকেল ইত্যাদিতে এর ব্যবহার যথেষ্ট।

অটো ইঞ্জিনের সফলতার প্রায় বিশ বছর বাদে রুডল্ফ ডিজেল (Rudolf Diesel) এক নূতন পদ্ধতিতে জ্বালানির দহন ঘটাতে সমর্থ হন। হাওয়ার উচ্চ সংনমন ঘটালে তার উষ্ণতা জ্বালানির জ্বলনাঙ্কের অধিক হয় এবং জ্বালানি আপনিই জ্বলতে আরম্ভ করে। এই ইঞ্জিনে সংনমন স্ট্রোকের শেষে উপযুক্ত হারে জ্বালানিকে প্রবেশ করান হয় যাতে দহন নিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়। জ্বালানি হিসাবে পেট্রলিয়াম জাত ডিজেল তেল ব্যবহৃত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই জার্মানিতে ডিজেল ইঞ্জিনের প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং সাবমেরিনেও ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে বিশাল আকারের একাধিক সিলিণ্ডার বিশিষ্ট, 15,000 অশ্বশক্তির অধিক ক্ষমতাশালী ইঞ্জিন জাহাজ চালানোর জন্য এবং অসংখ্য ছোট মাপের ইঞ্জিন বাস, গাড়ি, কলকারখানা এবং কৃষি পাম্প চালানর কাজে চালু হয়েছে।

বড় মাপের পেট্রল ইঞ্জিনে জ্বালানির বিস্ফোরণজনিত

[বাকী অংশ 22 পাতায়]

স্ফীত চাল (মুড়ি) বানাবার যন্ত্র

পূর্বাঞ্চলে স্ফীত চালের আঞ্চলিক নাম মুড়ি। অন্যান্য খাদ্যজাত শিল্প পণ্যের বিপরীতে মুড়ি বৃহদায়তনে উৎপাদিত হয় না। গ্রাম্যজাত মুড়ির উৎপাদন একটি বৃহদায়তন শিল্পে পরিণত হবে এমন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। গ্রামবাসীগণের পুরুষানুক্রমিকভাবে মুড়ি তৈরি করার ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে খাটুনির তীব্রতা হ্রাস করার জন্য আমাদের সংস্থা, হারভেস্ট এ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট টেক্‌নোলজি (আই. সি. এ. আর.) স্কীম। আই. আই. টি. খড়্গপুর, এই হস্তচালিত যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে।

এই যন্ত্র কেন :—

ভারতবর্ষে গ্রামে বসবাসকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই খুব সামান্য জমির মালিক নতুবা ক্ষেত-মজুর হিসাবে অন্যের জমিতে কাজ করেন। পূর্বাঞ্চলে ভাতই গ্রাম-বাসীদের মধ্যাহ্নের ও রাত্রের একমাত্র মুখ্য খাদ্য ; এবং মুড়ি তাদের সকাল ও সন্ধ্যার জলখাবার। মুড়ি তৈরি করার চিরাচরিত প্রণালীতে একমুঠো চালকে মাটির কড়াইতে গরম বালির উপর আলোড়িত করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদন অনেক কম, বেশ শ্রমসাধ্য এবং বিপদ-জনকও বটে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসী তথা গ্রামের যন্ত্র-শিল্পী ও কারিগরগণ চিরাচরিত পদ্ধতির কোন উন্নত পরিকল্পনা বা রূপকে সহজেই গ্রহণ করিবেন যদি উদ্ভাবিত যন্ত্রটি সহজ কার্যকরী হয়।

আপনার যন্ত্রটিকে জানুন :—

মুড়ি বানাবার চিরাচরিত পদ্ধতির মূলনীতি ও তত্ত্বকে সদ্ব্যবহার করে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই যন্ত্রটির মূল অংশ একটি চোঙাকৃতি আধার যার মধ্যে বালিকে গরম করা হয় এবং গরম বালি ও চালের মিশ্রণকে অবিরাম আলোড়িত করা হয়। কেন্দ্রীয় দণ্ডের তলায় আধারের ভিতরে একটি আলোড়ক যুক্ত আছে। এই দণ্ডটিকে আবর্তন করা হয় হাতলের সাহায্যে। চোঙাকৃতি আধারের তলদেশ শঙ্কু-আকৃতি ; এই তলদেশে একটি ছিদ্র আছে যেটা তৈরি মুড়ি ও গরম বালির মিশ্রণ নির্গমনের পথ। নির্গত করার জন্য দ্বারটিকে খুলতে হয়। যন্ত্রটিকে যে কোন গৃহজাত চুল্লী বা অগ্নিকুণ্ডের উপর স্থাপন করা যায় ; তবে এমন উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে যেন বস্তু (মুড়ি ও বালির মিশ্রণ) নির্গমনের নলটির কাজে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। বালি থেকে মুড়ি আলাদা করবার জন্য পৃথক একটি চালনির প্রয়োজন। কৃষিজাত আবর্জনা বা জ্বালানী কাঠ পুড়িয়ে আধারের ভিতরের বালিটা গরম করা যায়।

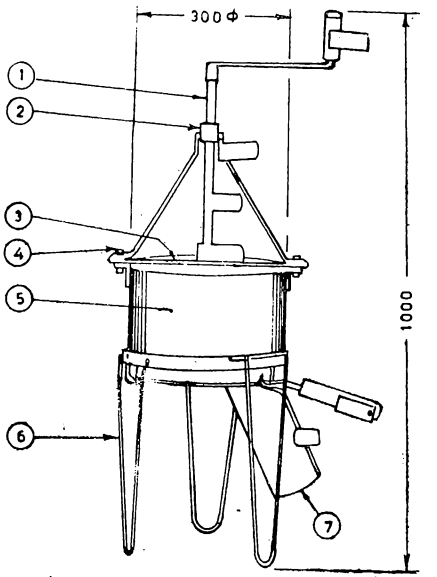

(1) SHAFT (2) BUSH
(3) AGITATOR FLIGHTS INSIDE (4) BOLTS
(5) SAND-RICE MIXTURE (6) STAND
(7) OUTLET
DIMENSIONS IN mm

RICE PUFFING MACHINE

মুড়ি তৈরির যন্ত্র

যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্যগত সূচী :—

উচ্চতা : 100 সেণ্টিমিটার

চোঙাকৃতি আধারের ব্যাস : 30 সেণ্টিমিটার

ওজন : 11 কেজি (প্রায়)

উৎপাদন ক্ষমতা : প্রতিদিন 50 থেকে 70 কেজি (8-10 ঘণ্টার মধ্যে)

চাল থেকে মুড়িতে পরিবর্তনের সময় : 12 থেকে 17 সেকেণ্ড যন্ত্রটি হস্তচালিত এবং ইহা যে কোন সাধারণ চুল্লীতে গরম করা হয়।

গবেষণা লব্ধ ফল :—

এই যন্ত্রের সাহায্যে চাররকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়েছে যথা—মুড়ি, ভাজা ছোলা, ভুট্টার খৈ এবং ধানের খৈ।

ক্রমিক সংখ্যা	উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যের নাম	কাঁচামালের পরিমাণ (গ্রাম)	স্ফীতকরণের সময় (সেকেণ্ড)	পর পর দুবার স্ফীতকরণের মাঝখানে বয়ে যাওয়া সময় মিঃ সেঃ	উৎপাদন ক্ষমতা কেজি/ঘণ্টা
1	মুড়ি (চাল থেকে)	400	15	2 : 30	6—8
2	ভাজা ছোলা	250	20	2 : 45	5—6
3	ভুট্টার খৈ	300	35	1 : 30	8—10
4	খৈ (ধান থেকে)	300	15	2 : 00	7—8

যন্ত্রটি ব্যবহার-এর কর্মসূচী ঃ—

1. চোঙাকৃতি আধারে 2 কেজি (1 কেজি যদি ভুট্টার খৈ তৈরি করতে হয়) বালি ঢালুন।

2. বালুকে 270° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করুন (গ্রামের মুড়ি প্রস্তুতকারকগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই তাপমাত্রা নির্ধারণ করেন।)

3. যে চাল থেকে মুড়ি তৈরি হবে তাকে আগেই গরম রাখতে হবে। এইবার নির্দিষ্ট পরিমাণে এই চাল আধারে ঢালুন।

4. হাতলটি আবর্তন করিয়া চাল ও বালির মিশ্রণকে 12 সেকেণ্ড ধরে ভাল করে আলোড়ন করুন।

5. ঘুড়ি ও বালির মিশ্রণকে নির্গত করুন একটি চালুনির উপর এবং তৎক্ষণাৎ চালুনিকে ঝাঁকিয়া বালি থেকে মুড়ি পৃথক করুন।

6. বালিকে পুনরায় ঢেলে দিন আধারের মধ্যে এবং উপরোক্ত কর্মসূচিটিকে পুনরাবৃত্তি করুন।

যন্ত্রটি ব্যয় সঙ্কোচকারীও বটে ঃ—

চিরাচরিত প্রথায় মুড়ি তৈরি করতে অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবীর প্রয়োজন এবং দিনে (8—10 ঘণ্টায়) 25 কেজির বেশি তৈরি করা যায় না। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে দিনে (8—10 ঘণ্টায়) 50—70 কেজি উৎপাদন করা যায়। ইহার সাহায্যে নীট লাভের পরিমাণও বাড়ান সম্ভব।

যন্ত্রটির উৎকর্ষ ঃ—

1. একটি সহজ, হস্তচালিত যন্ত্র—এটাকে ব্যবহার করবার জন্য বিশেষ কোন দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

2. যেহেতু মিনিটে মাত্র 90 থেকে 100 বার আলোড়কটিকে আবর্তিত করতে হবে, অনেকক্ষণ চালালেও যন্ত্র-চালক ক্লান্ত হবেন না।

3. পৃথক কোনও তেল চালিত ইঞ্জিন বা ইলেকট্রিক মোটর দরকার নেই।

4. এই যন্ত্রের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা চিরাচরিত প্রথার প্রায় চারগুণ।

5. সর্বোপরি, যন্ত্রটি বাহুল্যবর্জিত, টেকসই ও সুবহ ; এতে কৃষিজাত আবর্জনা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

সংগ্রাহক ঃ অমরনাথ রায়

হারভেস্ট এ্যাণ্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি
(আই. সি. এ. আর) স্কীম
পোস্ট হারভেস্ট টেক্‌নোলজি সেণ্টার
ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ্‌ টেক্‌নোলজি, খড়্গপুর
721302 এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

[20 পৃষ্ঠার পর]

নকিং (knocking) সমস্যার জন্য পেট্রল ইঞ্জিন সাধারণতঃ ছোট মাপেরই তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় মাপের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন উপযুক্ত।

চার-স্ট্রোক ইঞ্জিনের একটিমাত্র স্ট্রোক শক্তি যোগায়। এই ধরনের ইঞ্জিনের সাহায্যে সমভাবে শক্তি পাওয়ার জন্য সাধারণতঃ এক কাঠামোতে চার, ছয় বা আটটি পর্যন্ত ইঞ্জিন একত্র ব্যবহার করা হয়। সবগুলি পিস্টনই একটি ক্র্যাঙ্ক-শাফটে বাঁধা থাকে এবং শক্তি স্ট্রোকগুলির মধ্যে সময় সমান রাখা হয়। স্বভাবতঃই ইঞ্জিনের মোট ক্ষমতা একটি সিলিণ্ডারের ক্ষমতার ততগুণ যতগুলি সিলিণ্ডার ইঞ্জিনটিতে আছে। ভারতে নির্মিত গাড়িগুলির পেট্রল ইঞ্জিনে একত্র চারটি করে সিলিণ্ডার ব্যবহৃত হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার দুরূহ খুঁটিনাটিতে না গিয়ে এই হল মোটামুটি অন্তর্দহন ইঞ্জিনের কথা। যানবাহনের ক্ষেত্রে এবং যেখানে বিদ্যুৎ নেই এমন স্থানে ক্ষমতা যোগানর একমেবদ্বিতীয়ম উৎস।

37/2, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) কলিকাতা-700031

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

KJB/JULY/6/87

এমন সময়-
আরে বলটা এলো কোত্থেকে! দারুণ হেড্ করেছিস খুদে।
ঢাকাং
অঁক্!
নির্ঘাৎ আশেপাশে কেউ খেলছে। ওখান থেকেই এটা ছিটকে এসেছে।
আমাকে দে ওটা। এক শটে বলটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিই।
তার আগে এটা দিয়ে তোকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাই। নিউটনের একটা বিখ্যাত সূত্র আছে—
মেরেছে! পরের বল দিয়ে এ সব করা ঠিক নয় খুদে।
সূত্রটা হল, 'প্রত্যেক বলের বিপরীত এবং সমান প্রতিক্রিয়া আছে।' দেখ।
যাঃ! ফসকে বেরিয়ে গেল!
মনে হচ্ছে তোর বলটা কোন বে-জায়গায় গিয়ে সাংঘাতিক কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে!
এই যে, উল্লুককাঁহেকা! খুব পায়ের জোর হয়েছে না?
অঁক! হুঁ-না, মানে-

বুঝেছি! তুই যেমন পায়ের জোর দেখালি, আমিও আমার রিস্টের জোর দেখাই।
টিসুম্
ইয়াঃ!
ইস, বেচারা!
ধপাস্
এবার থেকে একটু সমঝে পায়ের জোর দেখাবি।
খুদে, ঠিক আছিস তো? তোর মাথায় মুখে একটু ঠাণ্ডা জলের ছিটে দেব?
ইস, দেখ তো, মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে কপালটা কেমন ফুলে উঠেছে!
হিক!
JULY·87
প্রথমত, ঠিক মত একটা শট্ করতে পারিস না। দ্বিতীয়ত, পরের বল। ঐ বল নিয়ে নিউটনের সূত্রের এক্সপেরিমেন্ট, তার প্রতিক্রিয়া তো এরকম হবেই!
দোষটা তাহলে কার? নিউটনের সূত্রের, না খুদের?
উল্লুক, গাধা, হেঁড়ে মাথাকোথাকার!
যাব্বাবা! আ-আমি কি দোষ করলুম!

গর্দভ! এ প্রতিক্রিয়া সে প্রতিক্রিয়া নয় রে উজবুক!
তাহলে!
তাহলে আর কি! ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যার কোন সাধারণ জ্ঞানই নেই তার সঙ্গে এ সব সূত্র নিয়ে আলোচনা বৃথা। সুতরাং—
যাঃ, ওটা আবার কি করলি?
আবার বলে বল-প্রয়োগ!
ছপাং
সর্বনাশ! ঐ দ্যাখ তোর বল প্রয়োগের কি রকম প্রতিক্রিয়া ছুটে আসছে!
অ্যাঁ!
ঐ-ঐ ওরা আমাদের বলটা ফেলে দিয়েছে! ধর ধর ওদের!
আরে ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ধরতে পারলে কি প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছিস না?
পরের বল নিয়ে এ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কি দরকার ছিল? এখন ঠ্যালা সামলাও!
একেই বলে গ্রহের ফের! বলের প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে নিজেই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় পড়ে গেলুম!

ইলেকট্রনিক্সের কথা ঃ দুই

বিপ্লব ব্যানার্জী

তাঁবের পাশাপাশি পরিবাহী (conductor), অর্ধ-পরিবাহী (semi-conductor) এবং অন্তরক (Insulator) পদার্থ নিয়ে বহু বিজ্ঞানী বহুদিন থেকেই নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। Semi-conductor crystal দ্বারা তৈরি Transistor সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে গেলে উপরোক্ত তিনটি পদার্থের উপর একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাই সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। পরিবাহী হল এমন বস্তু যার মধ্যে খুব সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে। মোটা-মুটি প্রায় সব ধাতুই খুব ভাল পরিবাহকের কাজ করে, এর মধ্যে রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ধাতুগুলি উত্তম পরিবাহকের কাজ করে তা আমাদের প্রায় সকলেরই একরকম জানা। কাঁচ, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটে, তাই এ জাতীয় পদার্থকে বলা হয় অন্তরক (Insulator) বা কুপরিবাহক। অর্ধ-পরিবাহী বা Semi-conductor-এর স্থান হল পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি কোন এক স্থানে। সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম হল এমন দুটো মৌল যা Electronics-এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ একদম খাঁটী সিলিকন বা জার্মেনিয়াম দ্বারা Electronics-এর কোন কাজ করা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। এখন সেমি-কণ্ডাকটার মেটেরিয়ালে নিজ নিজ পরমাণুগুলি একটি নির্দিষ্ট pattern বা আকৃতি অনুযায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো থাকে এবং সেই সূত্রানুসারে সেমিকণ্ডাকটার মেটেরিয়ালও এক ধরনের ক্রস্টাল বা কেলাস। ক্রস্টালের গঠন প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় ক্রস্টাল মধ্যস্থিত পরমাণুগুলি একে অপরের সাথে কিভাবে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের দ্বারা। একটা perfect crystal-এর পরমাণুগুলি একই pattern অনুযায়ী এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে সাজানো থাকে। অর্থাৎ State of the art of the arrangements of the inner atoms of the crystal-এ কোনরকম বিসাদৃশ্যতা নেই। এইভাবে single crystal semiconductor-এ প্রত্যেকটি unit cell of atoms একই দিকে সাজানো থাকে কিন্তু এখানে সেখানে কিছু সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। সামান্য কিছু অবিশুদ্ধ পদার্থমিশ্রিত জার্মেনিয়াম এবং সিলিকনের single crystal-ই Transistor তৈরির কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক বেশির ভাগ crystalline পদার্থই হল poly crystalline প্রকৃতির। একটি poly crystalline পদার্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের crystal orientation দেখা যায় এবং এই ধরনের poly crystalline crystal বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Semiconducting Device তৈরির কাজে অনুপোযুক্ত। শতকরা 100 ভাগই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের single crystal তৈরি করা একরকম প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তা Technology যতই উন্নত মানের হউক। একটা প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ Semiconductor crystal-এ অতি সামান্য কিছু বৈদ্যুতিক আধান থাকা সম্ভব, এর কারণ বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কিছু Convalent bond ভেঙে যায় এবং কিছু মুক্ত electron বেরিয়ে আসে, যা সামান্য কিছু charge carrier হিসাবে কাজ করে, তাই এই ধরনের প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ crystal-কে বলা হয় intrinsic semiconductor। কিন্তু এ ধরনের প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ Silicon বা Germanium crystal দ্বারা সোজাসুজি transistor তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই intrinsic semiconductor-এর সঙ্গে যৎসামান্য অবিশুদ্ধ পদার্থ মিশিয়ে যে semiconducting crystal তৈরি করা হয় তাকে বলে extrinsic semiconductor। এটা একটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে 10^8 সংখ্যক intrinsic semiconductor material-এর পরমাণুর সাথে যদি মাত্র 1টা অন্য কোন মৌলের পরমাণু খাদ বা impurity হিসাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ intrinsic semiconductor-এর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা প্রায় 20 গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং খাদ মেশাবার পর ঐ intrinsic semiconductor-টিকে বলা হয় extrinsic semiconductor।

Transistor তৈরির কাজে এই খাদ বা ভেজাল মেশানো খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ 100 ভাগ খাঁটি সোনা দিয়ে কোনরকম অলংকারাদি তৈরি করা আদৌ সম্ভবপর নয় আর হলেও তা হবে ব্যবহারের একেবারে অনুপযোগী। তাই খাঁটি সোনার সঙ্গে সামান্য কিছু তামা এবং রূপা ভেজাল হিসাবে মিশিয়ে সোনাকে একটু শক্ত এবং মজবুত করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়। সম্পূর্ণ নির্ভেজাল খাঁটি সোনা মাখনের মত এতই নরম যে ছুরি দিয়ে কেটে

ফেলা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট মাপের সামান্য কিছু ভেজাল মেশানো হয় এবং এই ভেজাল মেশাবার ব্যাপারটিকে বলা হয় doping। 27° সেণ্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় জার্মেনিয়ামের intrinsic resistivity হল 47 ohm-cm আর সিলিকনের হল 220,000 ohm-cm। অন্যদিকে জার্মেনিয়ামের gap-energy হল 0·72 electron volt বা 0·72 ev এবং সিলিকনের gap-energy হল 1·1 electron-volt বা 1·1 ev। এটা আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার যে কোন মৌলের পরমাণুর শেষ কক্ষের ইলেকট্রন-গুলি রাসায়নিক বন্ধন তৈরির ক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং শেষ কক্ষের ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর যে অংশে থাকে তাকে বলা হয় Valency band। Valency band এর পরেই একটি ফাঁকা অঞ্চল থাকে, তাকে বলা হয় Forbidden gap। আর এই অংশ শেষ হওয়ার পরেই আবার একটি অঞ্চল শুরু হয়, তাকে বলা হয় conduction band। Valency band এর কোন electron সহজাত গতিশক্তি পেতে গেলে তাকে প্রথমে Valency band অতিক্রম করে Forbidden gap এ আসতে হবে এবং সেখান থেকে আবার conduction band-এ আসতে হবে, তবেই সেমিকণ্ডাকটার কৃস্টালে বৈদ্যুতিক আধান বা charge এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট শক্তি পাবে। এখন একটা ইলেকট্রনকে valency band থেকে forbidden gap-এ আসতে গেলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় gap energy যার একক বা unit হল ইলেকট্রন-ভোল্ট বা ev। যেমন সিলিকনের বেলায় এই gap energy হল 1·1 ev এবং Diamond crystal এর বেলায় এই gap-energy হল 6 ev। বাইরের থেকে কোন electric field প্রয়োগ করে valency band এর ইলেকট্রনগুলিকে প্রবাহিত করা হয় conduction band এর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ conduction band, valency band এর মুক্ত el ctron-কে conduct বা চালিত করতে সাহায্য করে তাই তার নাম হল conduction band। আর Forbidden gap অনেকটা insulator এর মত কাজ করে এবং এই অঞ্চলে ইলেকট্রন নিজে থেকে প্রবাহিত হতে যথেষ্ট শক্তি পায় না তাই এই অঞ্চল অতিক্রম করার জন্য বাইরের থেকে কিছু electric field বা যে কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। সেমিকণ্ডাকটার কৃস্টালে conduction current সম্ভবপর হয় পর্যায়ক্রমে electron এবং hole তৈরির মধ্য দিয়ে। যে কোন crystalline semiconductor এর valency structure-এ electron এর ঘাটতি হলেই সেখানে 'hole' তৈরি হয়। কাজেই Hole হল একটা ধনাত্মক আধানযুক্ত mobile valency বা গতিশীল যোজ্যতা, যাকে positron কণিকা হিসাবে ভেবে নেওয়া যায়। সেমিকণ্ডাকটার কৃস্টালে দু-ধরনের current বিদ্যমান, এক হল "electron current" আর দ্বিতীয়টি হল "positive hole" current। এখন কৃস্টাল মধ্যস্থিত 'ইলেকট্রন' বা 'হোল' যে কোন ধরনের কণাই একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের আনুগত্যে থাকলে একটা গতি লাভ করে যা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $V = \mu$ যেখানে 'V' হল drift velocity যার একক cm/sec.

'E' হল ইলেকট্রিক ফিল্ড যার একক volts/sec. আর 'μ' হল কণিকাগুলির mobility factor যার একক cm^2/volt/sec. একটা সেমিকণ্ডাকটার কৃস্টালে যে ভেজাল বা impurity মেশানো থাকে তা সাধারণতঃ দুরকমের হয়। প্রথমটি হল Group-III impurity এবং দ্বিতীয়টি হল Group-V impurity, Group-III impurity বলতে বোঝায় পর্যায় সারণীর Group-III-র অন্তর্ভুক্ত কোন মৌল, যেমন বোরন (B) এবং এই বোরন পরমাণুর শেষ কক্ষে 3টি ইলেকট্রন আছে। আর Group-V impurity বলতে বোঝায় পর্যায় সারণীর Group-V র অন্তর্ভুক্ত কোন মৌল যেমন ফসফরাস (P) এবং এই ফসফরাস পরমাণুর শেষ কক্ষে 5টি ইলেকট্রন আছে। আবার আমরা জানি সিলিকন পরমাণুর শেষ কক্ষে আছে 4টি ইলেকট্রন। ফসফরাস পরমাণু সিলিকন পরমাণুর সংগে একত্রিত হয়ে Covalent bond এর মাধ্যমে 'Electron Octet' তৈরি করার সময় একটা অতিরিক্ত মুক্ত electron থেকে যাবে যা কৃস্টালে বৈদ্যুতিক আধান চলাচল করতে সাহায্য করবে। কাজেই Silicon crystal এ ফসফরাস হল 'donar impurity' বা 'donar element'। যে কোন Group V element-ই 'donar impurity' হিসাবে কাজ করতে পারে আর সিলিকন মৌলের সাথে ফসফরাস মৌল অশুদ্ধি হিসাবে মিশিয়ে যে Silicon crystal তৈরি হল তাকে বলা হয় n-type crystal। অনুরূপভাবে tetravalent silicon atom এর সাথে trivalent Boron পরমাণু মিশ্রিত হয়ে Covalent bond এর মাধ্যমে 'Electron Octet' তৈরি করার সময় একটা ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা যায়, যার ফলে Hole তৈরি হয়। আর এভাবে তৈরি Silicon crystal-টিকে বলা হয় p-type crystal এবং অশুদ্ধি হিসাবে বোরন মৌল মেশাবার জন্য বোরনকে বলা হবে accepter impurity। যে কোন Group III element-ই 'accepter impurity' হিসাবে কাজ করতে পারে। এখন Group III element-কে 'accepter impurity' বলার প্রধান কারণ হল, কোন Group III মৌলের পরমাণুর শেষ কক্ষের 3টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে, সিলিকন পরমাণুর শেষ কক্ষের 4টি ইলেকট্রনকে আর এভাবে একটা ইলেকট্রন ঘাটতি বা Hole

তৈরি হয়। কাজেই n-type semiconductor-এ বৈদ্যুতিক আধান চলাচল করতে সাহায্য করে 'free electron' আর p-type semiconductor-এ বৈদ্যুতিক আধান চলাচল করতে সাহায্য করে ঘাটতি ইলেকট্রন বা 'Hole'। একটা 'intrinsic semiconductor crystal' এ কোন charge carrior থাকে না, যৎসামান্য কিছু residual charge থাকা সম্ভব হয় সাধারণ তাপমাত্রায় কিছু Covalent bond ভেঙে গিয়ে কিছু free electron তৈরি হওয়ার জন্য। কাজেই p-type বা n-type semiconductor crystal যতই শুদ্ধ হউক না কেন তার মধ্যেও কিছু Group III এবং কিছু Group V element মিশ্রিত থাকে যা অশুদ্ধির কাজ করে। তবে p-type semiconductor crystal-এ বেশির ভাগ বা 'majority charge carriers' হল 'holes' এবং কমভাগ বা 'minority charge carriers' হল 'electrons'। অন্যদিকে n-type semiconductor crystal-এ বেশির ভাগ বা 'majority charge carriers' হল 'electrons' আর 'minority charge carriers' হল 'holes'। একটা 'electron' এবং একটা 'hole' পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে জোড়ায় জোড়ায় 'electron hole' pair তৈরি করে নিয়ে কিভাবে 'Semiconductor crystal' এ 'charge transfer' করে তা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কল-61

মে '87 সংখ্যায় প্রকাশিত ইলেকট্রনিক্স্-এর কলাকৌশল প্রবন্ধে 27 পৃষ্ঠায় 30 ও 35 লাইনে $1\cdot6\times10^{-19}$ এবং $9\cdot11\times10^{-28}$ এবং 28 পৃষ্ঠায় 9 লাইনে ঋণাত্মক এর বদলে ধনাত্মক পড়তে হবে।

মডেল বানাতে গিয়ে

রাজেশ গিরি

আমরা অনেকে আছি যারা নিজের হাতে ছোট খাট যন্ত্র বানাতে পারলে খুব আনন্দ পাই। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বইতে নানা যন্ত্র বানাবার সার্কিট দেখে কি করে তা বানাব বুঝতে না পেরে সে ইচ্ছা আর বাস্তবে রূপান্তরিত হয় না। অনেক সময় কোন সার্কিট দেখে সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে তৈরি করতে বসি কিন্তু তা হয়ত সফল হয় না আমাদের মডেল তৈরির সাধারণ জ্ঞানের অভাবে, হয়ত তৈরি করতে ভুল হয়েছে খুবই কম কিন্তু এ বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা আর তা ঠিক করতে না পেরে ভাবি সার্কিটটাই ভুল, এই ভাবে আমাদের মডেল তৈরির ইচ্ছাও কমে আসে। এইসব চিন্তা করে যাতে আর আগ্রহী মডেল নির্মাতাদের কোন অসুবিধা না হয় তাই আমি এই বিষয়ে নিয়মিত কিছু লিখতে চাই।

প্রথমে শুরু করা যাক ইলেকট্রনিক্স মডেল তৈরির গোড়ার অসুবিধা ও তার প্রতিকার নিয়ে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে ব্যবহৃত ডায়োড, ট্রান্জিস্টার, আই· সি· প্রভৃতি খুবই সেনসিটিভ : একটু বেশ গরম লাগলেই তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা যখন ট্রানজিস্টর বা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সোল্ডার করি অর্থাৎ সার্কিট অনুযায়ী জুড়ি বা ডিসোল্ডার করি অর্থাৎ যন্ত্র থেকে খুলি তখন রাং গলাতে গিয়ে কম্পোনেন্টগুলোকে গরম করে ফেলি। ফলে কম্পোনেন্টগুলো অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়, সোল্ডারিং এর দেরীর জন্যই এরকম ঘটে। তাই সোল্ডারিং করতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি সোল্ডারিং আয়রন অর্থাৎ তাতাল খুবই গরম কিন্তু রাং গলতে অনেক সময় নিচ্ছে। ফলে কম্পোনেন্ট খুব গরম হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু নির্ভর করে তাতালের উপর। কি করে খুব তাড়াতাড়ি সোল্ডার করা যায় তা বলছি। প্রথমে তাতালের তামার তৈরি মুখটা ছুরি দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর বিদ্যুৎ সংযোগ করে তাতাল গরম করে নিতে হবে, খুব গরম হয়ে গেলে আবার ছুরি দিয়ে ঘসে মুখটা চকচকে করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা রজনকোর রাং (সরু তারের মত যে রাং এর ভিতরে রজন দেওয়া থাকে) তাতালের মুখের সরু দিক থেকে পুরোটা ঘসে মাড়িয়ে দিতে হবে। পুরোটা মাড়ানো হলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাতাল ঠাণ্ডা করলে দেখা যাবে ওর মুখে চকচকে রাং এর আস্তরণ পড়েছে। পরে কোন কিছু ঝাল দেবার সময় অর্থাৎ সোল্ডার করার সময় তাতাল গরম করলে ওর মুখের রাং আগে গলবে এবং ঐ গলন্ত রাং এর সংস্পর্শে কঠিন রাং আসামাত্র গলে যাবে। ফলে তাড়াতাড়ি সোল্ডার করতে কোন অসুবিধা হবে না এবং যন্ত্র খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

মডেল বানানোর অসুবিধা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও লেখার ইচ্ছে আছে।

কালোজাম ॥ রবীন্দ্রনাথ সর

বিনে পয়সায় ভাল ফল বললে কারই না খেতে ইচ্ছা করে। আবার কালোজামের মতো ফল যদি হয় ছোটদের কাছে ত দই মিষ্টি থেকেও লোভনীয় মনে হয়। কালো রঙের কালোজাম কুলে ভরা ডালপালা ছেড়ে পাখিগুলো ত যেতেই চায় না। ফলের সময় এই গাছের তলায় শেয়ালদের খুব ঘন ঘন যাতায়াত চলে। তৃষ্ণা নিবারক, পুষ্টিগুণে ভরা জারক জাম ফলগুলো গ্রীষ্ম ও বর্ষার উপাদেয় ফল। রসময়, টসটসে, থোকাথোকা ফলগুলো গাছের শোভাও কম বাড়ায় না। খেতে না চাইলেও এই ফলগুলো সংগ্রহ করার মত বাসনা কিছুতেই দূর করা যায় না। প্রকৃতির কোলে, অবহেলায় বেড়ে ওঠা জামগাছগুলো অতিদ্রুত ঘন জঙ্গল গড়ে তুলতে অদ্বিতীয়। পেয়ারা, গোলাপজাম, কাজুপুট, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ কালোজামেরই পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল উভয় প্রকার জলবায়ুতে এরা জন্মায়। উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার বহু জঙ্গলে আজও কালোজামের বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই গাছটির সন্ধান মেলে।

বড় জাম, ক্ষুদে জাম, ভুঁই জাম প্রভৃতি নানান জাতের কালো জাম দেখা যায়। কোনটা কষায়-মধুর আবার কোনটা বেশ টক। জাম মাত্রই দ্বিবীজপত্রীর অন্তর্গত মার্টেসি (Myrtaceae) পরিবারের উদ্ভিদ। ইংরাজীর ব্ল্যাক প্লাম গাছটি—জাম্বু, জামুন, কালাজাম, নেরেডু, জামান প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ভারতে পরিচিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Eugenia jambolana বা Syzium cumini.

জামগাছ 15-20 মিটার পর্যন্ত উঁচু। জঙ্গলে এখনও অবশ্য 30 মিটার পর্যন্ত লম্বা গাছ পাওয়া যায়। কাণ্ডের ওপর বেশ পুরু ছাল থাকে। ছালে যথেষ্ট কষায় রস ও ট্যানিন পাওয়া যায়। বনে-জঙ্গলে, আইলের ধারে, পুকুর, খাল প্রভৃতি পাড়ে এই গাছগুলি বেশি দেখা যায়। কোন কোন গাছের ডালপালাগুলি বেশ দীর্ঘ এবং নিচের দিকে ঝুলে থাকে। সরলাকার পত্রগুলি বিপরীতমুখী হয়ে শাখাপ্রশাখার উপর সাজান থাকে। কচি পাতা একটু লম্বা ও লালচে রঙের। পরিণত পাতা ডিম্বাকার ও বেশ সবুজ। পাতার শিরায় বিশেষ ধরনের গ্রন্থির জন্য ছিঁড়লেই একটা হালকা গন্ধ পাওয়া যায়। পুরু না হলেও পাতাগুলো শক্ত। অনেকটা বকুল পাতার মত। পাতার কক্ষে সাধারণত কোন উপপত্র দেখা যায় না, বৈশাখ মাস থেকেই গাছে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। ছোট ছোট ফুলগুলো সমাঙ্গ এবং দ্বিলিঙ্গ বিশিষ্ট। গর্ভাশয়টি ফুলের নিচের দিকে থাকে আর উপরের দিকে 4-5টি বৃতি ও 4-5টি দলমণ্ডল সাজান থাকে। অসংখ্য পুংকেশরের প্রত্যেকটির মাথায় দু' কোষ যুক্ত পরাগধানী দেখা যায়। গর্ভপত্র ২-3টি। গর্ভদণ্ডটি একটু লম্বা। জ্যৈষ্ঠের শেষে এবং আষাঢ়ে ফলগুলো পরিণত হয়ে থাকে। ফল বেরি প্রকৃতির আর বীজগুলো অসস্যল। পাখি, শেয়াল, কুকুর এবং বানর বীজ সমেত ফল খেয়ে এক সঙ্গে অনেকগুলো বীজ মলরূপে ত্যাগ করে। আর এই বীজগুলি জল পেলেই অঙ্কুরিত হয়। অনেকগুলো বীজ এক সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে অনেক চারাগাছ সৃষ্টি করে। তুলে না ফেললে এগুলি সহজেই বেড়ে ওঠে এবং একটা কলোনী তৈরি করতে পারে।

কেবলমাত্র কালো জামের রসাল ফল খেয়েই আমরা রসনা নিবৃত্ত করি না এর অন্যান্য অনেক ব্যবহার আছে। অথর্ব বেদ, চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত প্রভৃতিতে এবং নানান ভেষজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কালো জামের পাতা, ছাল ও ফলের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সাদা ও রক্ত আমাশায়, বমনে, হঠাৎ রক্তপাতে, শয্যামূত্রে কচি পাতার রস ব্যবহার হয়। আবার গাছের ছাল চূর্ণ করে বা সেদ্ধ করে ক্ষতস্থানে, দাঁতের মাড়ি ব্যথায় প্রয়োগ বিধি আছে। পাকা ফল থেকে অরুচি, বমন, হাত ও পায়ের জ্বালা কমাবার জন্য ঔষধ তৈরি হয়। জাম ফলের রস সংগ্রহ করে হজমি জারক দ্রব্য তৈরিও হয়ে থাকে। পাকা ফলকে চাটনীও করা যায়। ঘরের কাঠামো, জানালা, দরজা বা কোন আসবাব তৈরিতে জাম কাঠ ব্যবহার করা হয়। গাছের ডালপালার সংখ্যা প্রচুর হয় বলে জ্বালানীও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পুনরুৎপাদনক্ষম জাম গাছগুলো যেহেতু খুব সহজ ভাবেই অতিঘন জঙ্গল গড়ে তুলে সুতরাং এই সহজ লভ্য গাছকে শুধুমাত্র রক্ষা করলেই অনেক প্রাকৃতিক বন আপনি গড়ে উঠবে।

বেলদা গঙ্গাধর একাডেমী, বেলদা, মেদিনীপুর।

ক্যাসিওপিয়া

শঙ্কর মল্লিক

কলকাতা কর্পোরেশন মাঝে মাঝেই এরকম করছে আজকাল। রেডিও আর কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিল শনিবার সন্ধে ছ'টা থেকে রবিবার ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শনিবার বিকেল থেকেই জল বন্ধ করে দিল আর আজ রবিবার, সকাল নটা পর্যন্ত কলগুলো সব শুকনো। রাস্তার মোড়ে একটা টিউব ওয়েল থেকে লোকেরা জল নিচ্ছে। তাও আবার সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন একজন করে জল নেয়া। এই বিরক্তিকর কাজটিই করতে হচ্ছিল আমায় সকাল থেকে। সবে তিন বালতি জল এনেছি আর চতুর্থ বালতি আনবার জন্য রাস্তায় পা দিয়েছি, বীরদর্পে প্রবেশ করল অনুকূল।

মেজাজ আমার খারাপ হয়েই ছিল। অনুকূলের এহেন দুঃসময়ে অনুপ্রবেশ দেখে মেজাজটা গেল আরো খারাপ হয়ে। ভ্রূক্ষেপ না করে বালতি হাতে বেরিয়ে গেলাম।

আর সেইটেই সম্ভবতঃ আমার অবিজ্ঞজনোচিত কাজ হল একটা। জল ভর্তি বালতি নিয়ে বেঁকতে বেঁকতে ফিরছি, ছলকে ছলকে জল পড়ে আমার পাজামা ভিজে যাচ্ছে, এরকম একটা কুদৃশ্যের দিকে কটাক্ষ করল অনুকূল। —এক বালতি জল আনতেই এই হাল, তা ক্যাসিওপিয়াতে গিয়ে এক গ্লাস জলও তুলতে পারবি না রে।

হি হি করে হাসছে সে।

তখন আমরা ক্লাশ এইটে পড়ি। আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক নিত্যানন্দ বাবু যোগেশকে পড়া ধরলেন, 'বলত আকবরের বাবার নাম কি?' যোগেশ কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বল্ল 'যতদূর মনে হচ্ছে স্যার শাজাহান।' নিত্যানন্দ বাবুত রেগে টং। 'বাঁদর, তুমি আকবরের বাবার নামও জান না, শাজাহানের ছেলের নামও জান না, দেখাচ্ছি তোমায় মজা।'

একটা প্রশ্নের দুটো ভুল উত্তর একই বাক্যে দেবার ফলে সেদিন যোগেশের দুটো কানই লোহিত তপ্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গটা মনে পড়ায় আমি বালতি তুলে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

ঘর থেকেই শুনতে পেলাম অনুকূল আবৃত্তি করে চলেছে 'ক্যাসিওপিয়া হল একটা নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম।

একে আমার অবস্থা কাহিল, তার ওপর সাতসকালে এই রসিকতা মোটেই পছন্দ হল না আমার। গা-পিত্তি জ্বলে গেল একেবারে। তবুও অচেনা একটা নাম শুনে অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—কি পিয়া?

—ক্যাসিও পিয়া।

—সেটা আবার কোথায়?

বালতিটা নামিয়ে রেখে দাঁড়াই আমি।—সেটা কি হনুনলুলুর রাজধানী নাকি?

—হনুনলুলুর রাজধানী কিরে? ভূগোলে ত দেখছি তোর অংকের মতই অবস্থা।

—তাহলে নিশ্চয়ই কাশারাংকা কিংবা……

—থাক থাক আর এগোসনি। যোগেশের মত কেস হয়ে যাবে।

সেই নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটা তারা আছে যেখানে একগ্লাস জলের ওজন হবে সাতশ পঞ্চাশ টন।

—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবে রে অতনু কিন্তু একগ্লাস জলও যে মুখের কাছে তুলে ধরবি সে শক্তি নেই।

—তুমি কি সেখান থেকেই আসছ নাকি, অনুকূল? দিদি প্রশ্ন করে এবার।

—ঠিক তা-নয়। তবে ক্যাসিও পিয়াই এবারে আমাকে বাঁচিয়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমি গতকাল ফিরেছি আফ্রিকা থেকে। কঙ্গোর জংগলের কথা ত তোমরা সবাই জানো। সেই জঙ্গলে এবার আমার যেতে হয়েছিল একটা বিশেষ কাজে। সেখানে গিয়েই বিপত্তি ঘটাল বাঁদরটা—ক্রিস্টোফার নিকোলাস। বড়ো মাপের বিজ্ঞানী কিন্তু বড্ডো ধরিবাজ। বেশি চালাকি করতে গিয়ে প্রাণটি দিতে বসেছিল।

অনুকূল সরাসরি গল্পে ঢুকে গেল এবার।

আফ্রিকায় এখনো এমন অনেক জায়গা আছে যেখানকার মানুষেরা আধুনিক সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারে না। তাদের জীবনযাত্রাও বিচিত্র। যেখানে আধুনিকতার লেশমাত্রও নেই তেমনি একটি জায়গায় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমাদের দলে ছিলেন নিকোলাস, দিমিত্রভ আর লিণ্ডোয়াল। নিকোলাস প্রধানতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তবে রসায়ন শাস্ত্রেও তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে, দিমিত্রভ প্রাণিবিজ্ঞানী, বর্তমানে ছত্রাকের ওপর নানা ধরনের গবেষণায় ব্যস্ত আর প্রফেসর লিণ্ডোয়াল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্রযুক্তি গবেষণায় ব্যস্ত। আমরা চারজনেই আফ্রিকার মাটিতে পা দিয়েছি একই উদ্দেশ্যে।

উল্কাপাতের ঘটনা সকলেরই জানা। অমাবস্যার ঘন অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকলে দেখা যাবে একটা তারা হঠাৎ ছুটে চলেছে। দেখা যাবে কোন তারা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ নিভে গেল। এ ঘটনাকে বলে তারা খসা। ব্যাপারটা কিন্তু জটিল কিছু নয়। মহাকাশে বহু কঠিন বস্তু তীব্রবেগে ছোটাছুটি করছে। সেগুলো যদি কোন কারণে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে তারা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেক সময় ঐ সব বস্তুগুলোর আকার-আয়তন এত বড়ো হয় যে সেগুলো পৃথিবীর ওপর আছড়েও পড়তে পারে। একে বলে উল্কাপাত। এগুলো সাধারণতঃ একাও নামে কিন্তু কখনো কখনো বৃষ্টির মতো উল্কাপাতও হতে দেখা গেছে। 1833 খ্রীস্টাব্দের 13ই নভেম্বর এরকমই উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল একবার। যেমন তার রঙের বাহার, তেমনি তার ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সেই উল্কাবৃষ্টিটি উত্তর অ্যামেরিকার প্রায় সম্পূর্ণ পূর্বাঞ্চল থেকেই দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ ক্যারোলিনার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—আমি তখন দরজা খুললাম এবং আমার পক্ষে বলা খুবই অসুবিধাজনক হবে যে কোনটি আমাকে বেশি উত্তেজিত করেছিল, ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যটি না নিগ্রোদের কান্নার শব্দ। শয়ে শয়ে মানুষ মাটিতে শুয়ে তীব্রস্বরে কেঁদে চলেছে আর কিছু কিছু মানুষ মাথার ওপর হাততুলে ভগবানের কাছে কাতর আবেদন জানাচ্ছে পরিত্রাণের আশায়।

আমাদের হিসেব অনুসারে ঐ সময়ে আফ্রিকার ঐ অঞ্চলটিতে এরকমই উল্কাবৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গেই এর সম্পর্ক। হ্যালির লেজ থেকেই এমনটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল এবার। 1833 খ্রীস্টাব্দেও হ্যালি দেখা দিয়েছিল আকাশে। দিমিত্রভ এসেছেন ভাইরাসের সন্ধানে। ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে ভাইরাসের যোগসূত্র আর তার সঙ্গে বিভিন্ন ছত্রাকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। আর নিকোলাস এসেছে উদ্ভিদের ওপর একটা বিশেষ রাসায়নিকের ক্রিয়ার ওপর গবেষণা করতে।

সেই সন্ধেটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ত্রেপলের তাঁবুর বাইরে আমরা দূরবীন লাগালাম। আরো নানা ধরনের টুকিটাকি যন্ত্রপাতিতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া ছোট্ট জায়গাটি ভরে গেল। সাপের ভয়ে কাঁটাতারের বেড়ার চারদিকে ফেনল স্প্রে করে দেয়া হল। কিন্তু অন্যান্য বন্য জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্য কি করা যায়। অনেক ভাবনাচিন্তা করেও যখন কিছু ঠিক করা গেল না তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই কাঁটাতারের বেড়াকে বিদ্যুতায়িত করে ফেলা হল। আমাদের জেনারেটারের 220 ভোল্ট তারের মধ্যে চলে গেল।

ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেলামেশারও চেষ্টা করেনি আবার আমাদের কোন কাজেও বাধা দেয়নি। কিন্তু তারা যে সমস্ত ব্যাপারটাই লক্ষ করে চলেছে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। সন্ধে পর্যন্ত কোনরকম ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেনারেটার চালু করা হল আর সেই সঙ্গেই শুরু হল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি।

চারদিকে গভীর অরণ্য, মাঝখানে একচিলতে খালি জায়গা—আর সেখানেই আমাদের বিদ্যুতায়িত কাঁটাতারের বেড়া দেয়া অস্থায়ী পরীক্ষাগার। চারকোণে চারটি বিশাল সার্চলাইট থাকলেও তা নেভানই ছিল কেননা দূরবীন দিয়ে হ্যালি আর উল্কা দেখার জন্য প্রয়োজন অন্ধকার আকাশ। সেই দিনটা ছিল অমাবস্যা—চাঁদ ওঠেনি আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। মাথার ওপরে একফালি আকাশে ঝলমলে তারার চাদর। আমরা সবে দূরবীনটাকে ঠিক-ঠাক করে নিয়ে বসতে যাবো এমন সময় একটা গুঞ্জন কানে

এল। ক্রমে সেই গুঞ্জন বেড়ে উঠল আর ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল শত শত মানুষ। হাতে মশাল চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে আমাদের।

লিণ্ডোয়াল কালবিলম্ব না করে কাঁটাতারের বেড়ার তড়িৎ বর্তনী ছিন্ন করে দিলেন।

—ওরা আমাদের লক্ষ্য করেই আসছে। যদি কাঁটা-তারের বেড়ায় হাত দেয় নির্ঘাৎ মারা পড়বে।

নিকোলাসের হাতে বন্দুক।

—কি করছেন প্রফেসর। বেড়ায় বিদ্যুৎ চালু থাকুক। ওরা এগুতে পারবে না। শুনেছি এ অঞ্চলের মানুষেরা মানুষ খায়।

—না, নিকোলাস। বেড়াটা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের জন্য, মানুষের জন্য নয়। ওদের সংগে ভাব করতে হবে। ওদের আক্রমণ করা চলবে না। তুমি বন্দুক রেখে দাও।

নিকোলাস রাজি নয়। সভ্যতার দম্ভে সে অসভ্য মানুষদের যন্ত্র দিয়ে সায়েস্তা করতে চায়। কিছুতেই নিকোলাসকে বোঝানো যাচ্ছে না যে চারটে মানুষ এতগুলো মানুষকে সায়েস্তা করতে পারবে না। সংখ্যার জয় এখানে সুনিশ্চিত। আমি, দিমিত্রভ, লিণ্ডোয়াল সবার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সে বেড়ার বিদ্যুৎ বর্তনী ফের জুড়ে দিল। লিণ্ডোয়াল তখন উপায় না দেখে ভোল্টেজটা কমিয়ে দিলেন একশো পঞ্চাশে। নিকোলাসের অজান্তে। অন্ততঃ মারা যাবে না কেউ এতে।

ওদিকে গুঞ্জন তখন কলধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। ম্যাকবেথের জংগল এগোনোর মত মনে হচ্ছে আগুনের জংগল চারদিক থেকে ছুটে আসছে আমাদের গ্রাস করতে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই হল। চারপাঁচ জন লোক বেড়ায় হাত দিয়েই ছিটকে পড়ে গেল দূরে। কোলাহল এক নিমেষে থেমে গেল। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তার পরেই, সর্দারের নির্দেশে শয়ে শয়ে তীক্ষ্ণ মুখ তরবারি আমাদের নিশানা করে স্থির হয়ে গেল।

লিণ্ডোয়াল সবকটি সার্চলাইট জ্বালিয়ে দিলেন। আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আমরা হাত তুলে দাঁড়ালাম।

—তারপর সেই অসভ্য মানুষেরা কি করল? তোমাদের রান্না করে খেয়ে নিল?

দিদি প্রশ্ন করে সরল ভাবে।

অনুকুল গায়ে মাখে না।

—না, বরং ঠিক তার উল্টো। অত্যন্ত সভ্য মানুষের মত আমাদের সংগে সব রকমের সহযোগিতা করল। কিন্তু অত সহজে তা হয়নি। আমাকেই শেষ পর্যন্ত ওদের সর্দারের সংগে কথাবার্তা বলতে হল। শুধু, আমরা দুর্বল, আমাদের দয়া কর এ সব বললে সব সময় কাজ হয় না। মিঠে—কড়া, নরম—গরম সব রকমই চাই।

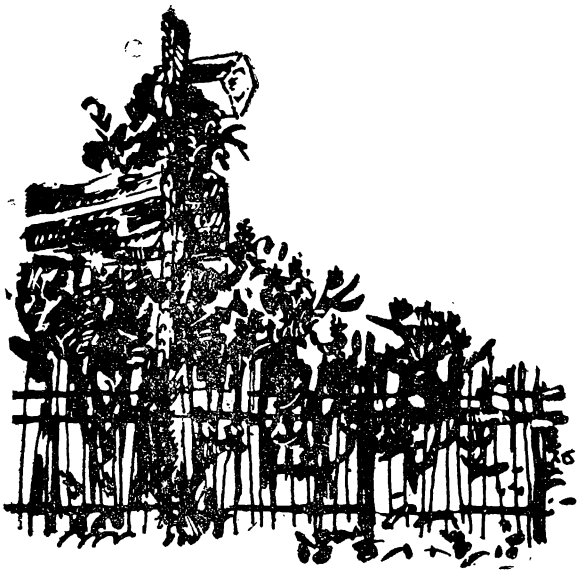

তারের বেড়া দেওয়া অস্থায়ী পরীক্ষাগারে……

আমরা আসলে দেবদূত এ রকমই একটা ধারণা দিতে হল ওদের। কুসংস্কারে বোঝাই ঐ মানুষগুলোকে এ ধোঁকাটা দিতে খুব অসুবিধা হয়নি। সর্দারকে ডেকে বল্লাম,

'তোমার শক্তি ত অনেক বেশি। তা—এই ছোট্ট পাথরটা তোল ত।'

একটা ছোট্ট পাথরের নুড়ি দেখিয়ে বল্লাম তাকে। ঘণ্টা চারেক অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সে ওটাকে নড়াতেও পারল না। আর তার পরেই নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা করল। বিনা রক্তপাতে বিশ্বজয়।

—কি ছিল সেই পাথরে?

—সে কথাই ত বলছি। বহুকাল আগে সাইবেরিয়ায় একবার একটা ধূমকেতু লেজ মাথা নিয়ে আছড়ে পড়ে। সৃষ্টি হয়েছে একটা বিরাট খাদ। সেখানে ছত্রাক সংগ্রহ করতে গিয়ে দিমিত্রভ ঐ ছোট্ট নুড়ি পাথরটি পান। তাঁর নিজের এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকায় উনি পাথরটি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ওর আপেক্ষিক গুরুত্ব মেপে বুঝতে পারলাম ওটি ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের গ্রহাণু। এখানে আসার সময় আমি ওটি নিয়ে আসি নতুন উল্কাপাত হলে ঘটনাস্থলেই যাতে তুলনামূলক গবেষণার কাজটি সারা যায়। আর ঐ পাথরের টুকরোটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রাণ বাঁচালো।

—তোমার ঐ পাথরের কারসাজিটা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না আনুকুল। এই টুকুন টুকরোকে নড়ানো যায় না…

—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি কাকাবাবু। আপনার ঐ কেরোসিন তেল আনবার পাত্রে যদি একপাত্র জল ভরি তবে ওটার ওজন দাঁড়াবে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ কিলো গ্রাম। পাত্রের ওজন বাদ দিলে পাঁচ কেজি জল। ঐ

একই পাত্রে যদি পারদ ভরি তবে একপাত্র পারদের ওজন হবে 5×13·6 অর্থাৎ 68 কিলোগ্রাম। ঐ এক পাত্র অসমিয়ামের ওজন 112·3 কিলোগ্রাম। ক্যাসিওপিয়ার ভাই ভ্যান-মা-আন তারা থেকে যদি মাটি এনে ঐ পাত্রে ভরে দি তবে তার ওজন হবে 20 লক্ষ কিলোগ্রাম। কোন মানুষ কি তার এক অংশও নড়াবার ক্ষমতা রাখে ?

বাবা মুগ্ধ হয়ে শোনেন ওর কথা।

—তাহলে এই ওজন বাড়ার কি কোন শেষ নেই ?

—তা জানি না। তবে সব চাইতে বেশি ওজন যা আমি হিসেব করতে পারি, তা হল নিউক্লিয়াসের ওজন। আপনার ঐ এক পাত্র নিউক্লিয়াসের ওজন হবে 5 লক্ষ কোটি টন।

অনুকূল ঘড়ি দেখে উঠে পড়ে। দিদি চিৎকার করে ওঠে।

—ও আনুকূল, যাচ্ছো কোথায় ? তোমার ঐ পাথরের টুকরোটা আফ্রিকায় নিয়ে গেলে কি ভাবে বলে যাও।

—সে আরেক দিন হবে খন।

হন্ হন্ করে যেমন ঢুকেছিল ঠিক তেম্নি হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় সে।

দিদি ভেতরের ঘর থেকে ঘুরে এসে হাসি মুখে জানাল।

—কি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পারে ছেলেটা। ডিসেম্বরের 17 তারিখ পূর্ণিমার আগের দিন। ও বলল কিনা অমাবস্যা। আর, ওর অংকের হিসেবগুলোও একটু মিলিয়ে নিস। যোগ করলাম আমি।

গ্ল্যাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট, যাদবপুর। কলকাতা-32

XI/XII শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

দুর্ঘটনার কারণ

কমল কান্তি সেন

গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছে আলোক তাঁর বন্ধু নির্মলের গ্রামের বাড়িতে। গ্রামটা বেশ বর্ধিষ্ণু নাম মতিপুর। গ্রামের পুব-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। গঙ্গার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তাটি একটা মস্ত বাঁক নিয়েছে। ঐ বাঁকের কাছে গাঁয়ের শ্মশান রয়েছে। ভূতের ভয়ে রাত্রিবেলা কেউ বড় একটা ওদিকে যায় না।

আলোক গ্রামে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটল সেই ঘটনাটা।.....

সকাল বেলায় গ্রামের সর্বত্র একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। গত রাত্রে নাকি শ্মশানের কাছে একটা ট্যুরিস্ট বাস উল্টে পড়েছে। মাঝে-মধ্যেই নাকি এরকম হয়। পুলিশ তদন্ত করেও এর কোন কিনারা পায় নি। গ্রামের লোকদের ধারণা শ্মশানেরই কোন প্রেতাত্মা এই দর্ঘটনার জন্য দায়ী। আলোক অবশ্য ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না।

কিছুক্ষণ পরে দুই বন্ধু বের হল ঘটনাস্থল দেখতে। পথে আলোক জিজ্ঞাসা করল নির্মলকে, "আচ্ছা নির্মল, তুই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস।"

—হ্যাঁ, করি।

আলোক বিস্মিত হল, তারপর বলল, "তুই বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস্ ? তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। আচ্ছা, এই যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এর পিছনে কি ভূতের হাত আছে ? তোর কি মনে হয় ?"

—'থাকতেও পারে, না'ও পারে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চলে আসে অকুস্থলে।

জায়গাটায় অনেক লোকজন গিস্‌গিস্ করছে। ওরা দেখল, একটা বাস রাস্তার ধারে প্রায় কাত হয়ে পড়ে আছে। ওরা শুনতে পেল বাসের চল্লিশজন যাত্রী সকলেই হাসপাতালে। ওরা চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওরা শ্মশান থেকেও একবার ঘুরে এল। তারপর বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে নির্মল বলল, "আলোক, কিছু বুঝতে পারলি নাকি, কেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে ?"

আলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মনে হয় পেরেছি। নির্মল, তুই আমাদের ফিজিক্স বইতে নিশ্চয় অভিকেন্দ্র বল আর অপকেন্দ্র বল পড়েছিস্। কোন গাড়ি যখন রাস্তায় বাঁক নেয়, তখন বাঁকের কেন্দ্র বরাবর গাড়ির উপর অভিকেন্দ্র বল আর উল্টো দিকে অপকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে। তাই, রাস্তার বাঁকের জায়গা একটু ঢালু করে তৈরি করা হয়। একে বলা হয় 'ব্যাঙ্কিং'। বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং কোণ অনুযায়ী গাড়ির বিভিন্ন স্পীড নির্ধারণ করা থাকে। তুই লক্ষ্য করেছিস্ কিনা জানি না, তোদের শ্মশানের কাছের ঐ বাঁকটা একদিকে ঢালু। আমার মনে হয় ওখানকার ব্যাঙ্কিং অনুযায়ী একটা স্পীড (গাড়ির) নির্ধারণ করা ছিল। কোন কারণে ঐ স্পীড-লেখা সাইন-বোর্ড বা ঐ জাতীয় কিছু হারিয়ে যায়। তারপর গাড়িগুলো ইচ্ছামত স্পীডে চলতে থাকত আর এভাবেই ঐ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বুঝলি, ওসব, ভূত-টুত স্রেফ বুজরুকি।

নির্মল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—হুঁ। বুঝলাম। তাহলে তুই বলছিস ভূত-প্রেত কিছুই নেই।

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমী, নদীয়া।

বারো ঃ অভিনব ভাষণ

'হে নরবানরগণ! এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিলাম আপনাদের। এখন আপনারাই বিচার করুন। ভেবেচিন্তে বলুন, বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চারের শেষ পরিণতি হিসেবে জন্তুর মত খাঁচায় বন্দী হয়েই কি থাকতে হবে আমাকে? শত্রু মনোভাব নিয়ে কিন্তু আমি এই গ্রহে আসিনি—এসেছিলাম নিছক আবিষ্কারের কৌতূহল নিয়ে। আপনাদের দেখেছি সেই কৌতূহলের চোখ নিয়েই, জেনেছি অসাধারণভাবে আপনারা সমচরিত্রবিশিষ্ট—একই প্রকৃতির অধিকারী এবং রীতিমত সহানুভূতিসম্পন্ন, সমস্ত অন্তর দিয়ে তাই আপনাদের প্রশংসা না করে আমি পারছি না। সোরের গ্রহের সেরা ধীশক্তিদের কাছে তাই আমার একটা পরিকল্পনা পেশ করছি। আমার পার্থিব জ্ঞানের দৌলতে অনেক কাজে লাগতে পারি আপনাদের গবেষণায়। কয়েক মাসের বন্দী জীবনে আমিও কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি আপনাদের সান্নিধ্যে থেকে। যা শিখে এসেছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান আহরণ করেছি খাঁচার মধ্যে থেকেও। আসুন, যুক্ত হোক আমাদের প্রচেষ্টা! যোগাযোগ স্থাপন করা যাক পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে! মানুষ আর নরবানররা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলুক—মহাজাগতিক গুপ্ত রহস্যের কোনোটাই তখন আর অনুদ্ঘাটিত থাকবে না আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়!'

দম ফুরিয়ে গেছিল আমার। স্তব্ধ হতেই থমথমে নীরবতা নেমে এল বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারে। যন্ত্র চালিতের মত ঘুরে দাঁড়ালাম সভাপতি মশায়ের টেবিলের দিকে। জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে শেষ করে দিলাম এক চুমুকে। দুহাতে তালি বাজিয়ে খড়ির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলার মতই এই সহজ সরল ব্যাপারটার প্রতিক্রিয়া হল বিস্ময়কর—প্রচণ্ড হট্টগোলের সঙ্গে বলা যায় তুচ্ছ এই ঘটনা। অতবড় অ্যাম্ফিথিয়েটারটা চক্ষের নিমেষে প্রচণ্ড উৎসাহে ফেটে পড়ল যেন—সে কী কলরব, বিস্ময়োচ্ছ্বাস এবং অভিনন্দন—কড়িকাঠ দেওয়াল বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল অকস্মাৎ অট্টরোলে—হাজার হাজার নরবানরের দানবিক উল্লাসধ্বনিতে থরথর করে কাঁপতে লাগল পুরো সম্মেলন কক্ষ। ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ধ্বনির। কেল্লা মেরে দিয়েছি, এটা বুঝেছিলাম ভাষণ সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো সম্মেলন কক্ষ এভাবে বিপুল হর্ষে মুখরিত হয়ে উঠতে পারে। কানে তালা লেগে গেছিল সেই মুহূর্তে—অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি শুধু একটা কারণে—নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলাম নরবানরদের চার হাত পায়ে হাততালি দেওয়া দেখে। বাঁদরদের স্বভাবই তাই। একটুতেই পরমানন্দে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়। চার হাত পায়ে তালি বাজায়; হাজার হাজার নরবানরের চার হাত পায়ে তালি বাজানো দেখে তাই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—মাথা ঘুরে পড়ে যাই নি। নরবানর পরিবৃত হলাম এর পরের মুহূর্তেই—আনন্দে আত্মহারা গরিলারা মাঝে মাঝে বুক কাঁপানো বিকট চিৎকার ছেড়ে ধেই ধেই

করে নাচতে লাগল আমাকে ঘিরে। শিম্পাঞ্জী আর ওরাংওটাংরাও নাচছে সমান তালে। আস্তে আস্তে চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগলাম আমি। পায়ে জোর কমে আসতে লাগল। বেশ বুঝলাম টলছি, পড়ে যেতে পারি। মুহ্যমানের মত চেয়েছিলাম চারপাশে। দেখেছিলাম রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের চেয়ার ছেড়ে মঞ্চের এদিক থেকে সেদিকে পায়চারি করছে জেয়াস দুহাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ রেখে—ঠিক যেমনটি করত আমার খাঁচার সামনে। যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখেছিলাম শূন্য চেয়ারখানা এবং বসে পড়েছিলাম সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে। আর একদফা প্রবল করতালি আর উল্লাস নির্ঘোষে খানখান হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল সম্মেলন কক্ষ। স্মরণীয় সেই দৃশ্যের এর বেশি আর দেখতে পাইনি, শুনতেও পাইনি—অভিভূতের মত হাত নেড়ে অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতেই হারিয়েছিলাম চেতনা।

ধকল তো কম যায় নি মনের ওপর দিয়ে—ফলে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম অনেক পরে। দেখলাম শুয়ে আছি একটা ঘরে বিছানার ওপর। সেবা করছে জিরা আর কর্নেলিয়াস। ইউনিফর্মধারী একদল গরিলা ঠেকিয়ে রাখছে কৌতূহলী জনতা আর সাংবাদিকদের। ঠেলাঠেলি করে প্রত্যেকেই আসতে চাইছে আমার কাছে।

কানে কানে বলল জিরা—'দারুণ! দারুণ জিৎ হয়েছে তোমার!'

কর্নেলিয়াস বলল—'এবার আমরা মিলেমিশে অনেক কিছুই করতে পারব—কেউ আটকাতে পারবে না।'

শুনলাম, সোরোর গ্রহের গ্র্যান্ড কাউন্সিল এইমাত্র বিশেষ অধিবেশনে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখুনি মুক্তি দেওয়া হোক আমাকে।

'বাধা দিয়েছিল কয়েকজন ঠিকই,' বলল কর্নেলিয়াস—'কিন্তু হার মেনেছে জনমতের চাপে।'

শুধু তাই নয়, আমাকে গবেষক সঙ্গী হিসেবেও পেয়েছে কর্নেলিয়াস—রাজি হয়ে গেছে গ্র্যান্ড কাউন্সিল। জোরদার গবেষণা চালানোর স্বপ্নে তাই সে মশগুল। আমার সাহায্য পেলে কত কি-ই না করা যাবে সোরোর গ্রহে!

'এইখানেই থাকবে এখন থেকে। আমার ফ্ল্যাট খুব কাছেই। সিনিয়র অফিসার ছাড়া এদিকে কেউ থাকে না।'

হতভম্ব চোখে তাকালাম চারপাশে—স্বপ্ন দেখছি না তো? আরামে থাকার সব বন্দোবস্তই রয়েছে ঘরখানায়। নতুন অধ্যায়ের শুরু হল আমার জীবনে। এই রকমই তো চেয়েছিলাম আমি। পেয়েছিও। তা সত্ত্বেও হঠাৎ খাঁচাটার জন্যে মন কেমন করছে কেন?

চোখাচোখি হল জিরার সঙ্গে। ভারি বুদ্ধিমতী। বুঝে নিয়েছে আমার মনের কথা। মৃদু হেসে তাই বললে—'মানুষ সঙ্গীদের জন্যে মন কেমন করছে তো? কিন্তু এখানে পাবে না কাউকে।'

ধরা পড়ে গিয়ে মুখ লাল করে ফেললাম। উঠে বসলাম কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে। গায়ে শক্তি ফিরে এসেছে। নতুন জীবন যাপন করতে পারব অনায়াসেই।

জিরা বললে—'বন্ধুদের একটা মিটিং ডেকেছি। শিম্পাঞ্জী প্রত্যেকেই, আসতে পারবে?'

সানন্দে পারব, বলেছিলাম জোর গলায়—কিন্তু উপযুক্ত জামাকাপড় চাই। এরকম অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তার পরেই খেয়াল হল পরনে রয়েছে পায়জামা—কর্নেলিয়াস নিজের পায়জামা পরিয়ে দিয়েছে আমাকে। কিন্তু শিম্পাঞ্জীর কোটপ্যান্ট পরলে কি আমাকে মানাবে? বদখৎ দেখাবে না?

'কাল অনেক নতুন কোটপ্যান্ট করিয়ে দেব। আজকের সন্ধ্যায় যা পরবে, তাও খারাপ নয়। এই তো এসে গেছে দরজি।'

ছোটখাট চেহারার একজন শিম্পাঞ্জী ঘরে ঢুকে সসম্ভ্রমে সেলাম জানাল আমাকে। অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে থাকার সময়েই নাকি সেরা দরজি এসে মাপ নিয়ে গেছে আমার। রাজধানীর খানদানী গরিলারা জামাপ্যান্ট করায় এই দরজির কাছে।

দক্ষতা আছে বটে শিম্পাঞ্জী দরজির। হাত আর পা চলল ঝড়ের বেগে। দু ঘণ্টাও লাগল না, তৈরি করে দিল চলনসই একটা সুট। অনেকদিন পর ফের সভ্যভব্য হয়ে নিজেরই অদ্ভুত লাগছিল। জিরাও এমনভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে যেন এই প্রথম দেখছে। ফিটিং ঠিকঠাক করতে যখন ব্যস্ত দরজি শিল্পী, সেই ফাঁকে সাংবাদিকদের ঘরে ঢুকিয়ে নিল কর্নেলিয়াস। অনেকক্ষণ ধরে দরজায় দুমদাম করে ঘুসি মেরে চলছিল বেচারারা। ঘণ্টা খানেক গেল তাদের কৌতূহল মেটাতে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে ঝাঁঝরা হয়ে গেলাম যেন। ফটোর পর ফটো তুলে গেল ফটোগ্রাফাররা। পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের জবাব দিতে হল, কিভাবে মানুষ সেই গ্রহে জীবনযাপন করে—তার বর্ণনা দিতে হল। সানন্দেই এত কথা বলে গেলাম আমি, নিজে তো সাংবাদিক। এরাও সাংবাদিক। আমারই সতীর্থ। খবরের কাগজের ক্ষমতাও আমার অজানা নয়। প্রচার দরকার এখন খুব বেশি। আমার খবর ছাপিয়ে ওরা রাতারাতি কাটতি বাড়াবে ঠিকই, আমিও খ্যাতিমান হয়ে যাব চোখের নিমেষে।

বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে বিদায় নিল সংবাদ বুভুক্ষু রিপোর্টাররা। তৈরি হচ্ছি কর্নেলিয়াসের বন্ধুবর্গের মিটিংয়ে যাবো বলে, এমন সময়ে এসে পৌঁছোলো জানাম, খাঁচার প্রধান পাহারাদার সেই গরিলা। আমি যে এখন সোরের গ্রহের কেষ্ট বিষ্টুদের চোখের মণি, এ খবর

তার অজানা নয়। ঘরে ঢুকেই তাই সসম্ভ্রমে প্রণিপাত হলই বলা যায়। সম্মান প্রদর্শনের বহর দেখে হাসি পেল। জিরাকে বললে, আমার অবর্তমানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে মানুষদের সব কটা খাঁচায়। হট্টগোলের সূত্রপাত করেছে নোভা। এখন প্রত্যেকেই এমন লাফঝাঁপ চিৎকার আরম্ভ করেছে যে হাজার খুঁচিয়েও কাউকে ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না।

জিরা নিজেই তক্ষুনি যেতে চেয়েছিল আমাকে কর্নেলিয়াসের কাছে রেখে, কিন্তু জিদ ধরলাম আমি। নিয়ে যেতে হবে আমাকেও। অদ্ভুত চোখে জিরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললে – এসো।'

গেলাম দুজনে খাঁচা ঘরে। সত্যিই খুব দাপাদাপি জুড়েছে নোভা। আমাকে দেখেই কিন্তু চেয়ে রইল অবাক হয়ে। এক ডেলা চিনি দিতেই খপ করে কেড়ে নিয়ে চালান করে দিল মুখে। দেখে কষ্ট হল আমার। মানুষ জাতটাকে এ অবস্থায় দেখা যায় না।

জিরাকে নিয়ে চলে আসবার আগেই খাঁচার অন্যান্য মানুষরাও শান্ত হয়ে গেছিল নোভাকে শান্ত হতে দেখেই। আমি কিন্তু বেরিয়ে এলাম ভারাক্রান্ত মনে।

কর্নেলিয়াস আর জিরার সঙ্গে গেলাম নাইট ক্লাবে। মন খারাপ থাকার জন্যেই বোধহয় মদ্যপান করেছিলাম আকণ্ঠ। অথবা, অনেকদিন মদ্যপানের সুযোগ না থাকায় লোভ সামলাতে পারিনি। কিন্তু অভ্যেস নেই বহু-দিনের, ফলে বেহেড হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।

শিম্পাঞ্জী মেয়েরা ঘিরে ধরে আমাকে

নাইট ক্লাবের সব ঘটনা তাই স্পষ্ট মনে নেই। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। সুরা পরিবেশনকারী গরিলা ওয়েটারকে মানুষ ওয়েটার বলেই মনে হয়েছে—গরিলা মনে হয় নি। শিম্পাঞ্জী মেয়েরা ঘিরে ধরেছে আমাকে—কাউকে শিম্পাঞ্জী বলে মনে হয়নি—মানুষ মেয়ে মনে হয়েছে। বুদ্ধি করে দুজন দেহরক্ষী এনেছিল কর্নেলিয়াস—তাই অটোগ্রাফ শিকারীদের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছি—তা সত্ত্বেও সই দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। নাচের আসরে কাউকেই নরবানর বা নরবানরী মনে হয়নি—নর এবং নারী মনে হয়েছে।

এই রকম একটা ঘোরের মধ্যে শেষ হয়েছে নাইট ক্লাবে মেলামেশার আসর। সোরোর গ্রহেই যখন আমাকে থাকতে হবে, তখন এরকম একটা অনুষ্ঠানের দরকার ছিল খুবই। অনুষ্ঠান শেষে কিন্তু আমি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলাম প্রফেসর অ্যাপ্টেলের কথা ভেবে। বন্দীদশায় খাঁচায় রয়েছেন তিনি, আর আমি কিনা ফুর্তি করছি নাইট ক্লাবে।

আশ্বাস দিয়েছিল কর্নেলিয়াস। প্রফেসরের খোঁজ সে নিয়েছে, বহাল তবিয়তেই আছেন। আমার মন মানে নি, তক্ষুনি দেখা করতে চেয়েছি। একটু ভেবে নিয়ে কর্নেলিয়াস বলেছিল—'তাহলে চলো। আজকের দিনে কেউ বাধা দেবে না। চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরকেও আমি চিনি।'

বেরিয়ে এলাম তিনজনে নাইট ক্লাব থেকে। গাড়ি হাঁকিয়ে গেলাম চিড়িয়াখানায়। তখন রাত কাটে নি, ডিরেক্টর হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল চোখ কচলাতে কচলাতে। আমার আশ্চর্য কাহিনী কানে গেছে বুঝতে পারলাম। সবিনয়ে জানালে, যার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি, তাকে দেখা যাবে এখুনি। তবে খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে বার করে নিয়ে যেতে গেলে কাল পর্যন্ত সবুর করতে হবে—কাগজ পত্র সই করানো দরকার।

যাই হোক, গেলাম সবাই মিলে প্রফেসর অ্যাপ্টেলের খাঁচায়। জনা পঞ্চাশেক মানুষ ঘুমোচ্ছে তখনও—ভোর তো হয় নি। প্রফেসরকে দেখলাম এক কোণে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে।

সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। প্রফেসর চিনতে পারলেন না আমাকে।

বললাম—'প্রফেসর অ্যাপ্টেলে, আমি ইউলিসি মেরো। দুর্দিনের অবসান ঘটেছে—সুদিন এসেছে।'

ছিটকে দূরে সরে গেলেন প্রফেসর। সভয়ে তাকাতে লাগলেন আশেপাশে। এত ভয় কিসের? কর্নেলিয়াসও দেখলাম বিচলিত হয়েছে। চোখ কুঁচকে ভাবছে।

আবার গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে। প্রফেসরের চাহনি ঘোলাটে। ধীশক্তির লেশমাত্র নেই চাহনিতে। পশু বনে গেছেন পশুবৎ মানুষদের সান্নিধ্যে থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় ঘুরিয়ে পালিয়ে গেলেন আরও দূরে।

আমি ভাবলাম, গরিলা আর শিম্পাঞ্জীদের দেখে ভয় পাচ্ছেন। একা চাইছেন আমাকে। তাই কর্নেলিয়াসকে বললাম, ডিরেক্টর আর জিরাকে নিয়ে বাইরে যেতে। এক কথায় রাজি হয়ে গেল ওরা।

খাঁচার মধ্যে মানুষ ছাড়া এখন আর কেউ নেই। কোট-প্যাণ্ট পরে সভ্যভব্য হয়ে আছি শুধু আমি।

প্রফেসরের চোখে চোখ চেয়ে বললাম—'প্রফেসর, বিপদ কেটে গেছে। এ গ্রহে আর আমরা অসহায় নই। আমি আপনার শিষ্য, আপনার বন্ধু, আপনার সঙ্গী ইউলিসি মেরো।'

ঈষৎ হাঁ করলেন প্রফেসর। ভেবেছিলাম কথা বলবেন। তার বদলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অমানবিক এক হুঙ্কার—যে হুঙ্কার পশু ছাড়া আর কারও কণ্ঠ দিয়ে বেরোয় না! [আগামী সংখ্যায় ঃ নতুন জীব]

ছড়া

বল কেন

বল কেন দুধ কেটে হয়ে যায় নষ্ট ?
মহাকাশে গেলে কেন হয় শ্বাসকষ্ট ?
বারমুডা ট্রাঙ্গেলে আছে কি রহস্য ?
কবে হবে পরমাণু মানুষের বশ্য ?
চন্দ্রের বুকে কেন দেখা যায় গর্ত ?
মাঝে মাঝে কি কারণে কাঁপে বল মর্ত্য ?
পথ খুঁজে পায় কিসে যাযাবর পক্ষী ?
ব্যাঙ কেন শীতকালে হয়ে থাকে লক্ষ্মী ?
বলো দেখি তেতো কেন উচ্ছে ও পলতা ?
দিনরাত গুন্‌গুন্‌ কেন করে বোলতা ?
বাদুড়েরা শোয় কেন মাথা করে নীচেতে ?
কি কারণে লেজ নাই মানুষের পিছেতে ?
কিসে গড়া হয়ে থাকে অস্থি ও মজ্জা ?
চটপট বলে ফেল মিছে পাও লজ্জা।

—অরিজিত দত্ত

19/1/9, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-6

জলাতঙ্ক রোগ
খুবই মারাত্মক
কিন্তু আপনি তা
প্রতিরোধ করতে পারেন
কি ভাবে এই রোগ হয় ?
—ক্ষিপ্ত পাগলা পশু—বিশেষ করে কুকুর কামড়ালে এই রোগ হয়ে থাকে।
—একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে কারণ জলাতঙ্ক রোগ সারাবার কোন চিকিৎসা হয় না।
প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা
—জলাতঙ্ক রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত পোশা কুকুরদের এই রোগ প্রতিরোধকারী টীকা দিয়ে নেবেন।
—রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের ধরতে এবং সরিয়ে ফেলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন। কারণ বেওয়ারিশ কুকুরেরা সাধারণতঃ ক্ষিপ্ত ও পাগল হয়ে পড়ে এবং তাদের মাধ্যমে গৃহপালিত কুকুরদের এই রোগ সংক্রামিত হয়।
—যদি আপনাকে কুকুরে কামড়ায় তবে ক্ষত স্থান সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যাবেন।
জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা
—ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা নিন।
কোটলা রোড,
davp 87/72 Beng.

ফিশ্ (Fish) অথচ মাছ নয়

সন্দীপ সেন

মাছ জলে বাস করে। স্থলের সমস্ত প্রাণীর তুলনায় মাছ অর্থাৎ ফিশের (Fish) সংখ্যা বেশি। অনেক মাছের নামের শেষে ফিশ্ (Fish) শব্দ জুড়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন হ্যাগফিশ্, ডগফিশ্, সোর্ডফিশ্, স্ফিশ্, মিল্কফিশ্, ক্যাটফিশ্, র‍্যাটফিশ্ ইত্যাদি। এই নামকরণ করা হয়েছে। তার কারণ ক্যাট বা র‍্যাট অথবা সোর্ড বা স্ জাতীয় প্রাণী বা বস্তুটির সঙ্গে মাছটির প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের নামের শেষে ফিশ্ (Fish) শব্দ থাকলেও তারা আসলে মাছ নয়। এরকম কয়েকটি ফিশ্-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

কাট্‌লফিস (Cuttlefish) বা সিপিয়া (Sepia) একটি সামুদ্রিক কম্বোজ (Molluse) জাতীয় প্রাণী। অক্টোপাসের নিকট আত্মীয়। পৃথিবীর সর্বত্রই অগভীর

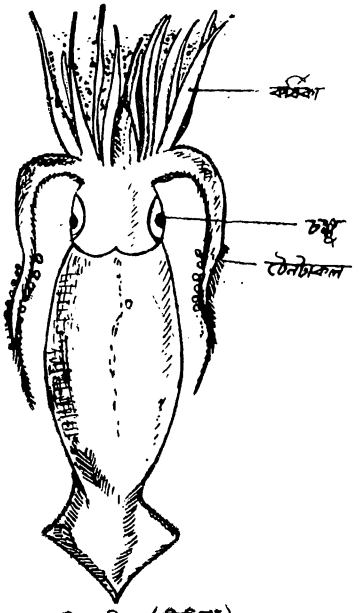

কাটল ফিস (সিপিয়া)

সমুদ্র জলে পাওয়া যায়। দেহটা মাথা, ঘাড় ও দেহ কাণ্ড তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মাথায় একজোড়া বড় বড় চোখ ও পাঁচজোড়া শুঁড়ের মত বাহু আছে। বাইরের দিকে বাহু জোড়া অন্য চার জোড়ার চেয়ে বড় এবং এতে চোষক বা সাকার আছে। এগুলোকে কর্ষিকা বা টেনটাকল বলে। সিপিয়া জলের মধ্যে রকেট যেভাবে যায় সেভাবে গমন করে অর্থাৎ জেটের মত জল পেছনে ছাড়ে এবং সামনে এগিয়ে যায়। সিপিয়ার একটি আশ্চর্য এবং মজার আত্মরক্ষার অঙ্গ আছে। যাকে কালি গ্রন্থি বা Inkgland বলে। ভয় পেলে বা কেউ আক্রমণ করলে সিপিয়া এর থেকে ঘন কালো কালি ছিটিয়ে দেয়। ফলে জলে তখন তাকে দেখা যায় না এবং সে সরে পড়ে।

জেলিফিশ্ (Jellyfish) বা ফাইসেলিয়া একনালী দেহী প্রাণী এবং এটিও সমুদ্রের লোনা জলে বাস করে।

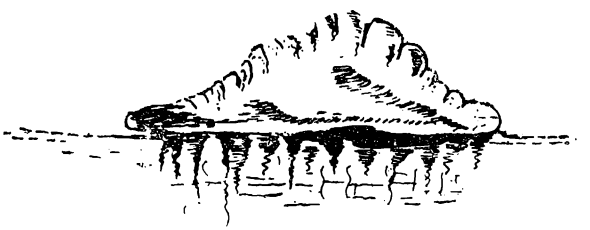

জেলি ফিস্,

সমস্ত জেলী ফিশের দেহের ভেতরে একটি গ্যাস ভর্তি বেলুনের মত ব্লাডার থাকে যাকে দেখতে অনেকটা সাবান ফেনার বুদবুদের মত। প্রাণীটির দেহে কোন রকম অস্থি নেই। এর চোখ, নাক, কান বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই। আসলে এই প্রাণীটি একটি প্রাণী নয় পলিপ নামে ছোট ছোট কতগুলি প্রাণী ফাইসেলিয়া কলোনী গড়ে তোলে। জেলিফিশের একটি প্রজাতি 'পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়্যার"-এর নিডোব্লাস্ট যুক্ত কর্ষিকা মানুষকেও আহত করে।

সিলভার ফিশ্ (Lepisma) একটি সন্ধিপদ শ্রেণী পতঙ্গ। খুব ছোট, নরম রুপালী মাছের মত দেখতে প্রাণীটি। এরা পত্রের মধ্যে থাকে। বিশেষতঃ অল্প আর্দ্রতায় এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। কাপড়, বই, কাগজ ইত্যাদির স্টার্চ অংশ এদের খাদ্য। ফলে এই জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য বই বাঁধানর সময় এবং কাপড় বেশি দিন মজুত করতে হলে তাতে স্টার্চ ব্যবহার না করা উচিত।

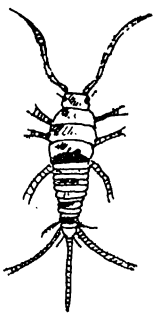

সিলভার ফিস্,

বি. এস. এস. ভি. ফর বয়েজ, 1/4 বারোয়ারীতলা রোড, কলকাতা-10

হিমোডায়ালিসিস অশোক কুমার মাইতি

আমাদের দেহে পেটের দু'পাশে দুটি বৃক্ক (Kidney) থাকে। বাদামী রং-এর বৃক্ক দুটি শিমবীজের মতো এবং লম্বায় 4/5 ইঞ্চির আকৃতি বিশিষ্ট। প্রতিটি বৃক্কে লক্ষাধিক লম্বা প্যাঁচানো নালিকা থাকে। এদের নেফ্রন (Nephron) বলা হয়। এর এক প্রান্ত এমন একটি নলে গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে মূত্র (Urine) সংগৃহীত হয়। অপর প্রান্তে আছে বাটির মত বোম্যান্‌স ক্যাপ্‌সুল (Bowman's Capsule), প্রতিটি বোম্যান্‌স ক্যাপ্‌সুলের গহ্বরে রেনাল ধমনীর শাখা থেকে উৎপন্ন রক্ত জালক জট পাকিয়ে একটি কুণ্ডলী গঠন করে। এর নাম গ্লোমেরুলাস (Glomerulus). এটি অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবক (ultra filter) রূপে কাজ করে।

গ্লোমেরুলাসের ভিতরে রক্ত উচ্চচাপে থাকে, তাই রক্তের জলীয় অংশ, অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ সহ, জালকের দেওয়াল দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। এই পরিস্রুত দ্রবণ প্রথমে বোম্যান্‌স ক্যাপ্‌সুলে সঞ্চিত হয়,

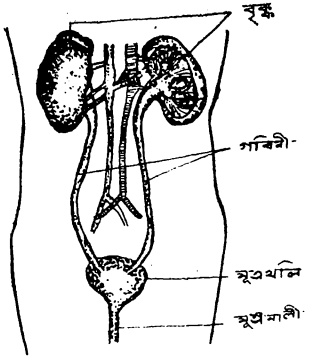

মানুষের রেচনতন্ত্র

তারপর নিকটবর্তী নালিকায় চলে যায়। এই অংশে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনরায় অবশোষিত হয় এবং রক্ত স্রোতে ফিরে আসে।

বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ বা দেহের আবর্জনা বিভিন্ন প্রকারে দেহ থেকে অপসারিত হয়। এই অপসারিত হওয়ার অঙ্গগুলি হল বৃক্ক, ফুসফুস, চর্ম, পৌষ্টিক নালী এবং লালা গ্রন্থি। বৃক্ক বর্জ্য পদার্থের প্রায় 75 শতাংশ অপসারণ করে বলে একে প্রধান অপসারণ অঙ্গ বা রেচন অঙ্গ বলা হয়।

দেখা গেছে আমাদের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় 180 লিটার তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়ে আসে,

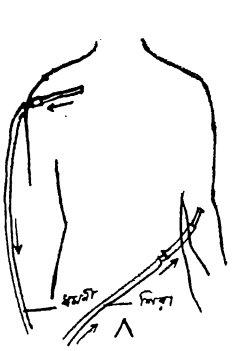

সাবক্লেভিয়ান ভেন

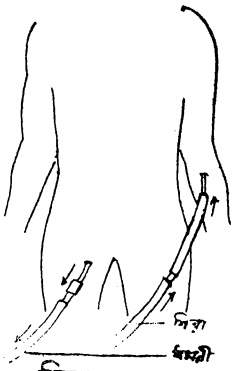

ফিমোর‍্যাল ভেন

কিন্তু মূত্র নির্গত হয় এক থেকে দেড় লিটার মাত্র। এই মূত্র গবিনী (Ureter) দিয়ে এসে মূত্রাশয়ে (Urinary bladder) জমা হয়। এর মধ্যে আবর্জনা হিসেবে থাকে প্রধানতঃ ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন এবং কিছু অজৈব লবণ। মূত্রাশয় পূর্ণ হলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়। এইভাবে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন এবং অজৈব লবণ প্রভৃতি দেহের বাইরে চলে যায়।

এই সুন্দর ব্যবস্থা যতদিন আমাদের শরীরে অটুট থাকে ততদিন আমরা সাবলীল এবং সাচ্ছন্দে জীবনধারণ করি। কিন্তু যখন বৃক্কের কার্যক্রম অকেজো হয়ে যায় তখন আর রক্ত থেকে আবর্জনা পৃথক হ'তে পারে না। এই অবস্থাকে বৃক্ক অকেজো বা Kidney failure বলে। তখন উপযুক্ত সময়ে কৃত্রিম বৃক্ক (Artificial Kedney) ব্যবহার করে দূষিত রক্তকে পরিস্রুত করা হয়।

ঝিল্লি বা অর্ধভেদ্য পর্দা (Semipermable membrane.) দিয়ে কৃত্রিম বৃক্ক তৈরি। এই অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে রক্তের অপ্রয়োজনীয় পদার্থের পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে ঝিল্লি বিশ্লেষণ বা ডায়ালিসিস (Dialysis) বলা হয়। অর্ধভেদ্য পর্দার এক পাশে শরীরের রক্ত ও অপর পার্শ্বে ডায়ালাইজেট (Dialysate) চলাচলের

ব্যবস্থা থাকে। বিশ্লেষক ঝিল্লির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ রক্তের অধিকাংশ দ্রাব্য বস্তুই সহজে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু বর্জ্য পদার্থের কণা অতিক্রম করতে পারে না। ফলে এই পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই তাদের পৃথক করা যায়। মানুষের শরীরে এইরূপ পদ্ধতিতে ডায়ালিসিস করাকে হিমোডায়ালিসিস (Hemodialysis) বলা হয়।

এই প্রক্রিয়া ব্যাপন (Diffusion) ও অভিস্রাবণের (Osmosis) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শোষণের সময় বৃহদাকার খাদ্যকণার ক্ষুদ্রান্ত্রে আটকে পড়া, রক্ত পরিস্রাবণের সময় কোলয়েড পদার্থের গ্লোমারিউলাস ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যেতে না পারা এবং সাধারণতঃ অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিনের রক্ত জালিকা থেকে কলারসে প্রবেশ করতে না পারা ইত্যাদি সবই ডায়ালিসিসের সঙ্গে জড়িত।

এছাড়াও কতকগুলি কারণে বৃক্ক অকেজো হ'লে হিমোডায়ালিসিসের পথ অবলম্বন করতে হয়।

(1) শরীরে রক্তচাপ বেশি বেড়ে গেলে বৃক্কের সরু সরু রক্ত জালিকা নষ্ট হ'য়ে গেলে।

(2) বিভিন্ন প্রকার বংশগত বৃক্কের ব্যাধি হলে।

(3) মূত্র থলি (Urinary bladder) ইনফেক্টেড (Infected) অথবা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে সেই রোগ গবিনী (Ureter) এবং বৃক্কতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন বৃক্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

(4) মধুমেহ (Diabetes) রোগ হলে।

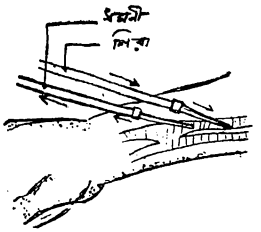

আর্টারিও ভেনাস ফিস্টুলা

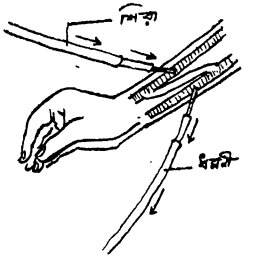

গ্রাফ্‌ট

(5) মূত্রনালীর অবরোধ (Urinary tract Obstraction) হলে। ইত্যাদি।

এছাড়াও বিষাক্ত সাপে কামড়ালে বা কেউ বিষ খেলে তাদের ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়।

হিমোডায়ালিসিসের জন্য সাধারণতঃ চারটি পদ্ধতিতে রোগীর শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হয়।

(1) আর্টারিওভেনাস সাণ্ট পদ্ধতিতে,

(2) আর্টারিওভেনাস ফিস্টুলা পদ্ধতিতে,

(3) ফিমোর‍্যাল ভেন বা সাবক্লেভিয়ান ভেন দিয়ে,

(4) গ্রাফ্‌ট (Graft) পদ্ধতিতে।

এবার আসছি কি ভাবে হিমোডায়ালিসিস করা হয়।

রোগীর শরীর থেকে ধমনীর (Artery)—(arterialised vein). রক্ত নিয়ে সেই রক্তকে কৃত্রিম বৃক্কের মধ্য-দিয়ে পরিস্রুত রক্ত শিরার (vein) মাধ্যমে রোগীর শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই রক্ত সরবরাহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় হেপারিন সংমিশ্রণ করান হয় যাতে শরীরের বাইরে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারে। রক্ত থেকে যে বর্জ্য পদার্থ আলাদা হয় তা জলের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই সবকিছুই মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

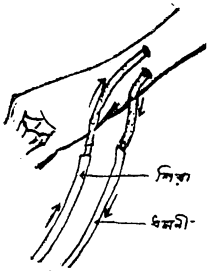

আর্টারিও ভেনাস সাণ্ট

রোগীর শারীরিক অবস্থানুযায়ী সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন এবং 3 থেকে 5 ঘণ্টা ডায়ালিসিস করা হয়।

ক্রনিক অকেজো বৃক্ক (Cronic Kidney failure) রোগীদের সারাজীবন হিমোডায়ালিসিসে থাকতে হয়। অবশ্য যদি নতুন বৃক্ক (Original Kidney) লাগানো যায় এবং লাগানো পদ্ধতি কৃতকার্য হলে তার আর Dialysis দরকার হয় না। অ্যাক্যুট অকেজো বৃক্ক (Acute Kidney failure) রোগীদের কয়েকটি Dialysis করলেই রোগী ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এবার আসবো ডায়ালিসিস পৃথিবীতে আবিষ্কার হ'ল কখন—আজ থেকে 75 বছর পেছনের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে হাজির হলে ডায়ালিসিসের উদ্ভাবন রহস্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সময় তিন জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী Mr. J. J. Abel, Mr. L. G. Rowntree এবং Mr. B. B. Turner প্রাণীজীবনে ডায়ালিসিস করে শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যে শরীরের বাইরে বার করা যায় সে পথ দেখিয়ে গেছিলেন। 1944 সালে নেদারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী Dr. W. J. Kolff মানুষের শরীরে প্রথম ডায়ালিসিস করে অদ্ভুতভাবে কৃতকার্য হন। তখন থেকেই হিমোডায়ালিসিস চালু হয়। অবশ্য হাসপাতালে নিয়মিত হিমোডায়ালিসিস চালু হয় 1956 সালে। চিকিৎসা জগতের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশ ডায়ালিসিস পদ্ধতিতেও ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, 99, শরৎ বসু রোড, কল-26

জুলে ভার্ণ-এর দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
রূপায়ণ- গৌতম কর্মকার

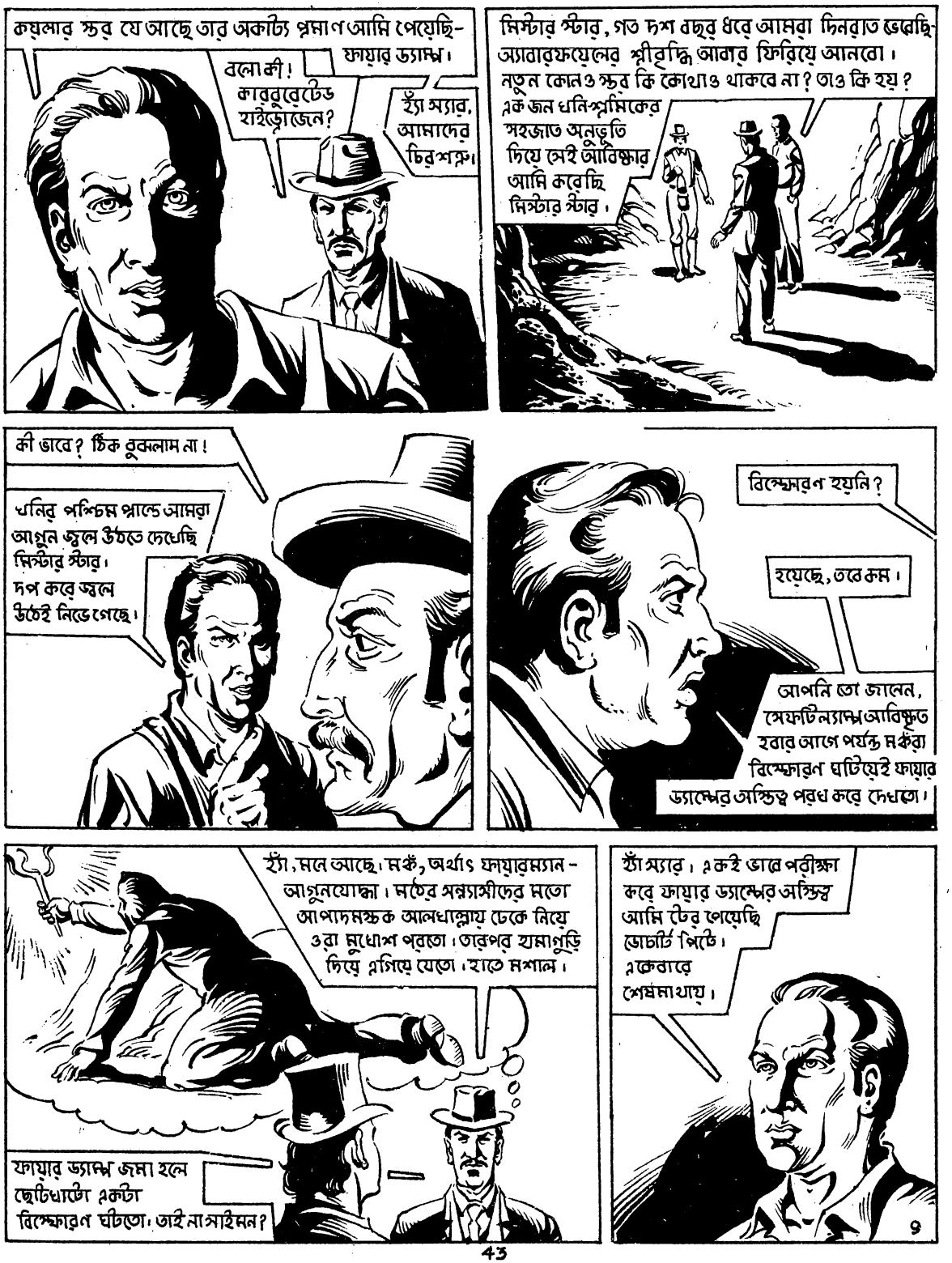

যথাস্থানে পৌঁছে গেলেন সবাই।

ফায়ার ড্যাম্প এখানেই দেখা গেছে?

হ্যাঁ স্যার।

হ্যারির হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে তার জানিটা খুলে দিলেন সাইমন।

কই, আগুনের শিখা তো বাতাসে জ্বলছে। কোনও বিস্ফোরণ তো ঘটছে না। শব্দও হচ্ছে না। ফায়ার ড্যাম্পের পরিমান কম থাকলেও তো পট পট শব্দ হোত?

আশ্চর্য! এ কেমন করে সম্ভব? আমি নিয়মিত এখানে পরীক্ষা করে দেখেছি।

অন্য কোনও গ্যাসও তো হতে পারে সাইমন।

না স্যার, আমার কোনও ভুল হয়নি।

আমিও তা দেখেছি মিস্টার স্টার। কিন্তু...

চারপাশতন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলো হ্যারি।

বাবা, বাবা, এই দেখো। ওহ, কী কাণ্ড! বালি-সিমেন্ট দিয়ে ফাটলগুলো কে বন্ধ করে দিয়েছে। ফায়ার ড্যাম্প বেরুবে কী করে?

এ তারই কীর্তি মিস্টার স্টার, যে বারবার আমাদের বাধা দিয়ে চলেছে।

ঠিক আছে, তুমি গাঁইতি চালাও হ্যারি।

গাঁইতির কয়েকটা আঘাতেই ফাটলটা খুলে গেল...

দেখুন, দেখুন স্যার!

কী স্যার, কী মনে হচ্ছে?
আছে, আছে, কয়লা আছে। কিন্তু কী জাতের এবং কতোখানি?
কাল সকালে আমরা পরীক্ষা করে সব দেখবো স্যার।
পরের দিন সকাল…
ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে হ্যারি। এবার ডিনামাইটটা চেপে দে।
গুম--গুম--গুম....
বিস্ফোরণের খানিক পর--
...বুউউউউম!...
দেখুন স্যার, দেখুন। কেমন সুন্দর একটা গহ্বর এখানে জেগে উঠেছে।
বাবা, আমি নেমে যাই?
দাঁড়াও হ্যারি, বিষাক্ত বাতাসটা আগে বেরিয়ে যাক।
পনেরো মিনিট পর--
নাহ, কোনও শব্দ নাই। শিখাও কাঁপছে না। আমরা নিশ্চিন্ত।
লন্ঠন হাতে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করলো হ্যারি।
আরও খানিক পর...
কী ব্যাপার? খুলে বলুন তো মিস্টার স্টার। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, এখনো ফিরছে না কেন হ্যারি?
11

সুড়ঙ্গের কাছে এগিয়ে গেলেন স্টার--
হ্যারি! হ্যারি!
উত্তর নেই কেন? গহ্বরের ভিতর ও তলিয়ে যায়নি তো স্যার?
না না, সেতো ভয় করার কী আছে? ঐ - ঐতো একটা আলো দেখা যাচ্ছে!
মিস্টার স্টার, চলে আসুন। বাবা, মা, তোমরা এসো।
নিউ অ্যাবারফয়েলের দরজা আমরা খুলে দিয়েছি।
সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করলেন সবাই।
আশ্চর্য দৃশ্য! মনে হচ্ছে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও বিস্মৃত ধনির মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে।
ক্ষয়ীভূত শিলা গড়ে ওঠার ফাঁকে ফাঁকে কোনও প্রবল প্রবাহ এ পথ দিয়ে বয়ে গেছে। তারই সৃষ্টি এই গ্যালারী।
12

একটি সত্য কাহিনী

—লুসিয়্যান্

ভাবানুবাদঃ শ্রীধর সেনাপতি

[এশিয়া-মাইনর-এর ভেতরে এক শহর স্যামোসাটা'র অধিবাসী ছিলেন লুসিয়ান (Lucian) আনুমানিক A.D 125—180)। তার কাকা ছিলেন ভাস্কর। শোনা যায় কাকার কাছে তিনি শিক্ষানবিসি করতে করতে সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ল-কোর্টেও বেরিয়েছিলেন কিছুদিন। সরস ভাষায় বক্তৃতাও দিতেন। অবশেষে একজন বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচয়িতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তার সরস কলম শুধু তার সময়ের দর্শন এবং ধর্মের বিরুদ্ধেই সক্রিয় ছিল না, ছিল কালচারের বিরুদ্ধেও। 'A True Story' সম্পর্কে তার নিজের মত ঃ কাহিনীটি 'প্রাচীন কবি, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকগণের লেখা অলৌকিক কাহিনীর কমবেশি কৌতুককর প্যারডি।' এভাবে লুসিয়ান প্রমাণ রেখে-ছিলেন যে প্রাচীনতম সায়ান্স-ফিক্শন লেখকদের মধ্যে অন্যতম না হলেও তিনি অন্ততঃ তাদের একজন হয়ে দলে বসবার যোগ্যতা রাখেন। তাকে বলা হয়—'প্রাচীন নিদর্শনের H. G. Wells'। তার এই কাহিনীর শেষে লেখা ছিল 'চলবে'। 'তবে কথাটা', লুসিয়ানের তখনকার জনৈক বিমুগ্ধ পাঠকের বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য, 'সব চেয়ে প্রকাণ্ড এক ধাপ্পা।']

একদা আমি বেরিয়েছিলাম সমুদ্র-ভ্রমণে। অনুকূল বাতাসে পশ্চিমের সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়েছিল পিলার্স অব হারকিউলিস থেকে। আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আমার বুদ্ধিগত সক্রিয়তা। আকাঙ্ক্ষা এ্যাড্ভেঞ্চারের। কী আছে সমুদ্রের ওপারে, কারা ওদিকের অধিবাসী আমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পানীয় তো নিয়েছিলামই, যাদের সঙ্গে আমার মতের বেশ মিল পরিচিত এমন পঞ্চাশ জনকে সঙ্গীরূপে পেয়েছিলাম এই দুঃসাহসিক কাজে। আমাদের কাছে ছিল অনেক অস্ত্রশস্ত্রও। সুদীর্ঘ জলপথে কণ্টকর

ভ্রমণের জন্যে দক্ষ চালকদের বসিয়েছিলাম আমার হাল্‌কা পালতোলা আট দাঁড়ের নৌকোটিতে। যাই হোক, প্রথমে অনুকূল বাতাসের অভাবে আমাদের নৌকো একটা দিন আর রাতের জন্যে সমুদ্রতীর থেকে বেশীদূরে এগোতে পারেনি। ভূ-ভাগ অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ছিল তখনও। তবে দ্বিতীয় দিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পায়, ফুলে ওঠে সমুদ্রের বুক, নেমে আসে অন্ধকার। আমরা নিজেদেরকে সঁপে দিই প্রবল বাতাসের হাতে। এছাড়া আমাদের কিছু করারও ছিল না। বাতাস ঊনআশি দিন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। অবিশ্যি আশি দিনের দিন সূর্য হঠাৎ বেরিয়ে আসে। আমরা তখন দেখতে পাই অদূরে রয়েছে একটা উঁচু অরণ্যময় দ্বীপ, যাকে ঘিরে সফেন সমুদ্র তরঙ্গ সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। তরঙ্গ-মাঝে আগের উগ্রতা ছিল না। ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে এসেছিল ঝড়ের দুরন্তপনা।

প্রায় দ্বিপ্রহরে, যখন দ্বীপটির অস্তিত্ব আমাদের লক্ষ্যপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তখন আকস্মিকভাবে উঠে আসে এক ঘূর্ণিঝড়। আমাদের নৌকোকে ঘুরপাক খাইয়ে প্রায় তিনশত ফার্লঙ্‌ শূন্যে তুলে নেয়, পুনরায় সমুদ্রবুকে নামতে দেয় না। তবে ঊর্ধ্বে অবস্থানরত নৌকোর ক্যানভাসের পাল হাওয়ার সাহায্য পেয়ে ফুলে উঠে এনে দেয় নৌকোর একটা গতিও। অব্যাহত থাকে তার শূন্যপথে যাত্রা। ওভাবে শূন্যপথে ভ্রমণ করি আমরা সাতদিন সাতরাত্রি ধরে। আট দিনের দিন ওখানে একটা বিরাট দেশ আমাদের নজরে পড়ে। দেশটাকে একটা দ্বীপের মতো মনে হচ্ছিল। সুন্দর, গোলাকার। আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত। আমরা ওখানে পৌঁছে নৌকো বেঁধে অনুসন্ধান করে বুঝলাম স্থানটিতে বসবাস আছে ; চাষ আবাদ হয়। দিনের বেলা ওখানে কিছুই নজরে পড়েনি, তবে রাতের অন্ধকার নেমে আসার শুরু থেকে আমরা দেখতে পাই অদূরে কিছু বড় কিছু ছোট আকারের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ। আগুনের মতো রঙ্‌ তাদের। নিচের দিকে আমাদের নজরে আসে আর একটি দেশ যার ভেতরে রয়েছে শহর নদী সমুদ্র অরণ্য এবং পর্বতমালা। ওটা আমাদের নিজেদের পৃথিবী হতে পারে অনুমান করি।

দেশটির আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। কিন্তু গুরুভার বর্মে আর অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পাল্লায় পড়ে বন্দী হয়ে যাই। এদেশে ওদের নাম রাখা হয়েছে ভালচার-ড্র্যাগুন্‌স ! অশ্বের পরিবর্তে বিশালাকার শকুনদের পিঠে সওয়ার এইসব সৈন্য। শকুনদের তিনটে করে মাথা। তাদের আকার সঠিকভাবে বোঝানোর জন্যে একটা কথা বলি। একটা বড় বাণিজ্য

তরণীর মস্তবড় মাস্তুলও তাদের গায়ের একটা ছোট পালকের তুলনায় মোটা বা দীর্ঘ নয়। সারা দেশময় উড়ে উড়ে পাহারা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শকুনারোহী সৈন্যদের। কোন বিদেশীকে দেখলেই তাকে গ্রেপ্তার করে রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির হতে হবে। কাজেই আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজার কাছে। আমাদের দেখে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ লক্ষ্য করে রাজা মন্তব্য করেন, "বিদেশীগণ। তোমরা গ্রীকদেশের অধিবাসী, তাই না ?" আমাদের স্বীকারোক্তি শুনে বলেন, "এত সুদূর শূন্যপথ অতিক্রম করে তোমরা এখানে কী করে এলে ?" তাকে আমরা সমস্ত কথা বলি। শুনে আমাদের শোনাতে শুরু করেন তার নিজের কথা। তিনি নিজেও একজন মানুষ, নাম এন্‌ডিমিওন। একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজার

গদিতে। আমাদের মাথার ওপর আলো বিকিরণ করে যে চন্দ্র, এই দেশ হল সেই চন্দ্রলোক। এখানে আমাদের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। আমাদের প্রয়োজন মতো সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে। অনুরোধ করেন, আমরা যেন আস্থা না হারাই। 'সূর্যলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ আমি করে চলেছি" বলেন তিনি, 'তাতে যদি সফল হই, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে অতিশয় সুখের জীবন যাপন করতে পারবে।' আমরা শুধোই, 'শত্রু কা'রা, কী নিয়ে বিবাদ?' তিনি বলেন, 'চন্দ্রলোকের মতো সূর্যলোকেও বসবাস আছে, বুঝলে। সূর্যলোকের রাজা ফিথন্। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছে। এক সময়ে আমার রাজ্যের সবচেয়ে দুঃখী মানুষদের একসঙ্গে জড় করে তাদের জন্যে একটা কলোনী বানিয়ে দেবার পরিকল্পনা করি মনিংস্টার-এ। সেটা তখন খালি পড়েছিল, আগে কেউ আর বসবাস করার চিন্তা করেনি। তো ঈর্ষান্বিত ফিথন্ আমাদের ওই কার্জটির মধ্যপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তার এ্যাণ্টড্রগুন্স নিয়ে। তার পিঁপড়ে আরোহী সৈন্যবাহিনীর শক্তির কাছে তখন আমরা পরাজিত। সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। যাইহোক, এখন আমার যুদ্ধ করার ফের ইচ্ছে হয়েছে। কলোনীটা স্থাপন করতে চাই। আমার অভিযানে তোমরাও অংশ নিতে পারো, যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়। আমি তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে দেব আমার রাজকীয় শকুনারোহী সৈন্যদল আর পূর্ণ সাজসজ্জা! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে যাচ্ছি আগামীকাল।' 'ঠিক আছে', আমি বলি, 'যদি আপনি এটা ভাল মনে করেন।'

এবার শত্রু শিবিরের কথা। বামপার্শ্বে পিঁপড়ে-আরোহী এ্যাণ্ট-ড্র্যাগুনদের সঙ্গে স্বয়ং ফিথন্ উপস্থিত।

ফিথন্ যখন তার সৈন্যদল ওইভাবে সাজিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল তখন পতাকা উড়ছিল পত্ পত্ করে। দুপাশে গাধারা প্রাণপণে ডাকছিল। (গাধারাই তার দলের ভেরী-বাদক)। সূর্যলোকের সেনাবাহিনীর বামপার্শ্ব চম্পট্ দিয়েছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। শকুনারোহী সেনারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় পায়নি। আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। তারা সবাই নিহত হয় আমাদের হাতে। তবে তাদের ডান পার্শ্বের শক্তি আমাদের বাম পার্শ্বের তুলনায় ছিল বেশ উন্নত। তাদের আকাশ-মশকেরা পদাতিক বাহিনীকে অনুসরণ করে চলেছিল। তারপর, বিশেষতঃ যখন তারা দেখে যে তাদের বামপার্শ্বের সৈন্যরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত, তখন অবিশ্যি ছত্রভঙ্গ হয়ে পন্ পন্ করে পালিয়ে যায়।

আমরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে বিরত হয়ে ফিরে এসে দুটো ট্রফির বন্দোবস্ত করি। একটি ট্রফি মাকড়সার জালে পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধের জন্যে আর মেঘের ভেতর আকাশ-যুদ্ধের জন্যে অন্যটি। এইসব ব্যবস্থা যখন আমরা করছি ঠিক তখনই স্কাউটরা খবর দেয় যে যুদ্ধের আগে ফিথন্কে সাহায্য করার জন্যে যে ক্লাউডসেনটরদের আসবার কথা ছিল, তারা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। দেখতে দেখতে সত্যি তারা এসে পড়ে। তুলনাহীন সে দৃশ্য! ডানাওলা ঘোড়া আর মানুষে একাকার। বিশাল দেহী সব মানুষ। এক একটা ঘোড়ার চেহারাও মস্ত বড় বাণিজ্য তরণীর সমান। তাদের সংখ্যা আমি রেকর্ড করে রাখিনি এই ভয়ে যে কেউ কেউ ভাবতে পারে সেটা অবিশ্বাস্য। ছিল বিপুল সংখ্যকই। রাশি-চক্র (zodeac) থেকে আসা তীরন্দাজ ছিল তাদের দলের লীডার। তাদের বন্ধুরা পরাজিত দেখেই তারা ফিথন কে ফের এগিয়ে যেতে বলে। চন্দ্রলোকের সৈন্যদল তখন কিছুটা শৃঙ্খলা হারিয়ে শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ ধাবন করছিল। মেতে উঠেছিল লুঠপাটের কাজেও। ক্লাউডসেনটরেরা সুশৃঙ্খলভাবে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রলোকের সৈন্য-বাহিনীর ওপর। শহর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়ে তারা খতম করে দেয় অধিকাংশ পাখিকে। ট্রফি দুটো তাদের দখলে চলে যায়। তারা মাকড়সার জাল ছিন্নভিন্ন করে দ্রুতবেগে এসে আমাকে আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে বন্দী করে ফেলে। ওই সময়ে ফিথন্ও উপস্থিত ছিল। তারাও তাদের দিকে অন্যান্য ট্রফির ব্যবস্থা রাখে।

ওদিনই সূর্যলোকে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। টুকরো টুকরো মাকড়সার জাল দিয়ে আমাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। শহর দখল না করার সিদ্ধান্ত নেয় শত্রুপক্ষ। তবে তারা ফিরে যাওয়ার সময়ে হাওয়ার মধ্যে তৈরি করে দিয়ে যায় একটা প্রাচীর, সূর্যের আলো যাতে চন্দ্রলোকে আর না পৌঁছতে পারে। প্রাচীর ছিল ডবল। মেঘ দিয়ে তৈরি। ওই কারণে একটা অকৃত্রিম গ্রহণ লেগে ছিল চন্দ্র বুকে। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দিয়ে চন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হয়ে ছিল। এরকম একটা কঠিন চাপের মুখে পড়ে ওই প্রাচীর ভেঙে দেবার আবেদন জানান রাজা এন্ডিমিওন। করুণা ভিক্ষা করেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে যাতে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে না হয় তার জন্যে। বশ্যতা স্বীকার করে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আর যুদ্ধ না! ফিথন্ আর তার লোকজন বসে দুটো মন্ত্রণাসভায়। প্রথম দিন তাদের ক্রুদ্ধ করে তোলার জিনিসপত্র তারা সরিয়ে রাখে একপাশে। তবে মনগুলো নরম হয় দ্বিতীয় দিনে। নিম্নলিখিত শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়ঃ

'সূর্যলোকবাসীরা ও তাদের মিত্রগণ চন্দ্রলোকবাসী এবং তাদের মিত্র শক্তির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করছে এইসব শর্তে যে,

(ক) সূর্যলোকবাসীরা বিভেদ-প্রাচীর ভেঙে দিচ্ছে, পুনরায় চন্দ্রলোকে অভিযান করবে না, যুদ্ধে যাদের তারা বন্দী করেছে তাদের প্রত্যেককে হস্তান্তর করা হবে একটা যথানির্দিষ্ট মুক্তিপণ নিয়ে।

(খ) চন্দ্রলোকবাসীরা নক্ষত্রলোককে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবে। সূর্যলোকে তারা যুদ্ধ ঘটাবে না।

(গ) যদি এক দেশ আক্রান্ত হয় তাহলে অপর দেশ এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে।

(ঘ) চন্দ্রলোকের রাজা সূর্যলোকের রাজাকে বার্ষিক কর হিসেবে দশ হাজার গ্যালন শিশির প্রদান করতে বাধ্য এবং জামিনরূপে তিনি দেবেন তার দেশের দশ হাজার মানুষ।

(ঙ) মর্নিংস্টারের বুকে যে কলোনী প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেটা সকলের জন্যে। ইচ্ছে করলে তাতে যে কেউ অংশ নিতে পারে।

(চ) একটা ইলেক্ট্রামের ফলকে খোদাই করা সন্ধি-পত্রটি টাঙানো থাকবে শূন্য মাঝে সাধারণ জায়গায়।

যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের নাম এবং সীলমোহর ঃ

(সূর্যলোকের পক্ষে)	(চন্দ্রলোকের পক্ষে)
ফায়ারব্রেস	ডার্কলিং
পার্চার	মুনি
বার্নস	অলব্রাইট

ওই সমস্ত শর্তে শান্তি স্থাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলা হয় বিভেদ-প্রাচীর। আমরা—বন্দীরা ছাড়া পাই। চন্দ্রলোকে গিয়ে আমরা পেঁছিনোমাত্র সজলনেত্রে বন্ধুরা আমাদের সবাইকে স্বাগত জানায়। অভিনন্দিত হই স্বয়ং এনডিমিওন্ দ্বারাও। তিনি আমাকে ছাড়তে চাননি। তাকে আমি বলি, নিচে সমুদ্রে যেতে দিন আমাকে। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন বুঝিয়ে আমাকে রাজি করতে সক্ষম হবেন না, আমাদের নিয়ে সাতদিন ধরে আমোদ আহ্লাদ করার পর বিদায় জানালেন। এমন কি আমাকে অনেক উপহার দেন এনডিমিওন। কাঁচের তৈরি লম্বা ঝুল্ পোশাক দুটো। পাঁচটা ব্রোঞ্জের। নেকড়ে-তুল্য একটা বর্ম—তবে জিনিসগুলো আমি পথিমধ্যে কোথাও হারিয়ে এসেছি। ভদ্রতার খাতিরে এনডিমিওন-এর শকুনারোহী এক হাজার সৈন্য আমাদের প্রায় ষাট মাইল পথ এগিয়ে দিতে এসেছিল। যাত্রাপথে আমরা অনেক দেশ অতিক্রম করি। মর্নিংস্টার-এ তখন নতুন বসবাস শুরু হয়েছে। সেটা দেখে এগিয়ে যাই জ্যোডিয়্যাক-এর দিকে। সূর্যকে অতিক্রম করে একটা বন্দরে পেঁছিই। থাকি সমুদ্রকূলের কাছাকাছি। আমরা নিচে নামি না। যদিও আমার বন্ধুদের তেমন ইচ্ছাই ছিল। কারণ বাতাস ছিল প্রতিকূল। তবে আমরা দেখেছিলাম ওটা একটা সবুজ দেশ, উর্বর, জলের ব্যবস্থা চমৎকার আর এতসব জিনিসে পূর্ণ যে তা মুখে বলা যায় না। আমাদের দেখে ক্লাউড্-সেন্টরস, যারা ফিথন্-এর চাকরিতে ঢুকেছিল, উড়ে আসে আমাদের নৌকার কাছে। কিন্তু সন্ধিচুক্তি আমাদের রক্ষা করে। তারা ফিরে যায়। ইতিমধ্যে ভালচারড্যাগনরাও ছেড়ে চলে গিয়েছে আমাদের।

পরদিন দিনরাত ধরে শূন্য পথে নিম্নমুখী যাত্রা করে নৌকো আমাদের পেঁছে দেয় যে-শহরে, তার নাম ল্যাম্পটাউন। মহাশূন্যে শহরটার অবস্থান প্লাইঅ্যাডিজ এবং রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যবর্তী এক স্থানে, যদিও রাশিচক্র থেকে বেশ কিছুটা নিম্নে। ওখানে নেমে দেখি কোন মানুষ নেই। তবে সাধারণের পার্কে বন্দরে দল বেঁধে দৌড়াদৌড়ি করছে, হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আলোরা। কোন কোনটা বেশ ছোট, বলা যায় ক্ষীণজ্যোতি। কিছু সংখ্যক আবার এমনই বড় আর শক্তিশালী যে উজ্জ্বল দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের বাড়ি বা জায়গা রয়েছে। তারা মানুষের মতো এক একটা নামের অধিকারী। তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে শুনেছি আমরা। আমাদের কোন ক্ষতি না করে তারা আমন্ত্রণ জানায় অতিথিরূপে। যাই হোক, ভয়ে আমাদের কেউ কিছু মুখে তোলেনি বা চোখও বোজেনি। শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে তাদের একটি পাবলিক বিল্ডিং, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সারা রাত বসে তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাক দেয়। তাতে যে না সাড়া দেয়, হুকুম হয়ে যায় তার মৃত্যুদণ্ডের। ওই আলোটি নিভিয়ে দেওয়ারই অর্থ আইন বলে প্রাণ বধ করা। কোর্টে আমরা ছিলাম, দেখেছি যা ঘটে। আলোরা অভিযোগের যে সমস্ত জবাব দিত, শুনেছি। ওখানে আমরা চিনতে পারি আমাদের আলোকেও। বাড়ির খবরটবর সব জানায় সে।

রাত্রিটা আমরা ওখানে কাটাই। নৌকো ভাসাই পরদিন। আমাদের শূন্যপথ-যাত্রা অব্যাহত থাকে। মেঘের কাছ বরাবর নজরে পড়ে একটি শহর, নাম ক্লাউডকাক্কু টাউন। বাতাস মঞ্জুর না করায় শহরটিকে আমরা ঘুরে দেখে আসতে পারিনি। পরদিন সমুদ্র চোখে পড়েছিল। মহাশূন্যে আরেকটি দেশ ছাড়া সমুদ্র বুকে কোন ভূখণ্ড নজরে আসেনি। ওই দেশগুলো আমাদের চোখের সামনে দেখা দিতে শুরু করেছিল জ্বলন্ত আর উজ্জ্বল হয়ে। চতুর্থ দিন দুপুরের দিকে খুব মন্থর হয়ে পড়ে বাতাস। শক্তি হারায়। সমুদ্র বুকে নেমে আসে আমাদের নৌকো। জলের স্পর্শ পাওয়ামাত্র আমরা প্রচণ্ড ভাবে খুশী এবং সুখী। আনন্দ হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠি সকলে। সৌভাগ্যবশতঃ সমুদ্র তখন ছিল শান্ত, ধীর। সমুদ্র জলে নেমে একটু সাঁতার কেটে নিলে কেমন হয়, আমাদের সকলের ভয়ানক ইচ্ছে হয়েছিল।

165/6, ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া-6

ভূগর্ভের তাপশক্তি

পার্থসারথি চক্রবর্তী

লার্ডিরেলো হচ্ছে ইটালি দেশের একটা ছোট্ট জেলা। জায়গাটা উষ্ণ-প্রস্রবণে ভরা। উষ্ণ প্রস্রবণের ইংরাজী নাম হচ্ছে Hoat Spring; এখান থেকে সবসময় উত্তপ্ত বাষ্পের ফোয়ারা অবিরাম বেরিয়ে চলেছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বক্রেশ্বরের কাছে এই রকম একটা সুন্দর উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

লার্ডিরেলোর উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে কাউণ্ট পিয়েরা নামে একজন ভদ্রলোক ভারী আশ্চর্য হয়েছিলেন—সন্দেহ নেই।

আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরণীর বুকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সম্পদ, যুগযুগান্তর, শতাব্দীর, পর শতাব্দী ধরে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সেই সম্পদ প্রকৃতির বুক থেকে আহরণ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ঠিক তেমনি এই পৃথিবীর জড় পদার্থ যেমন বাতাস, মাটি, জল—এই সবও পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। এই জড় পদার্থ আছে বলেই পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। জড়ের সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদের যেমন একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে ঠিক তেমনি এই জড় পদার্থ থেকে আমরা পাই অফুরন্ত শক্তি সম্পদ। মনুষ্য সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনতুন শক্তির সন্ধানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা উঠে পড়ে লেগেছেন। আমার কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছোট্ট বন্ধুদের কাছে তাই পৃথিবীর শক্তি-সম্পদ সম্বন্ধে প্রায় নিয়মিতভাবে কিছু বলতে চাই। এই সংখ্যায় আলোচনা করব ভারী মজার এক ধরনের শক্তির কথা, যেটা ভূগর্ভের নিচে লুকিয়ে থাকে, মানুষ কৌশলে তাকে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে।

সেই সঙ্গে এই উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্প থেকে কি করে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করা যায় তা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিলেন খুব। সেটা 1904 সালের কথা। তখন থেকে কাউণ্ট পিয়েরার পদ্ধতি অনুসরণ করে 1914 খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রায় দুশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তখন পিয়েরার এই কাজকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি।

ইটালি দেশ মাত্র কয়েক বছর আগে উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্প শক্তি যার নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা জিয়োথারমাল পাওয়ার (Geothermal Power)—তার থেকে 362 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছে। আমেরিকা এই জিয়োথারমাল পদ্ধতির কৌশল খাটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে 400 মেগাওয়াট, নিউজিল্যাণ্ড 192 মেগাওয়াট, জাপান 130 মেগাওয়াট এবং রাশিয়া তৈরি করেছে 38 মেগাওয়াট।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—এই জিয়োথারমাল পাওয়ারটা কি? তোমরা সকলেই জানো ভূগর্ভের নিচে প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত রয়েছে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক উপায়ে নিউক্লিয়ার ধ্বংসের জন্য এবং ঘর্ষণ বলের জন্য প্রচুর পরিমাণে তাপ সঞ্চিত হয়ে থাকে। ভূ-গর্ভের

এই তাপের উষ্ণতা একশো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। ভূ-তাত্ত্বিক কোনও পরিবর্তন পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই তাপশক্তিকে মাটির উপরে নিয়ে আসে। উত্তপ্ত শিলা, গলিত ধাতু ও গ্যাস এইসব বেরিয়ে এলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে। মাটির নিচে অত্যধিক তাপের ফলে সেখানকার জল বাষ্পে পরিণত হয়। কোনও কোনও জায়গায় মাটির নিচে জলের চাপ কম থাকায় এবং উষ্ণতা খুব বেশি হওয়ার জন্য সেখানকার জল ফুটতে থাকে। এই ফুটন্ত জল বাষ্পের আকারে শিলা ইত্যাদির গহ্বরে জমা হয়। যখন এই প্রাকৃতিক তাপশক্তি শিলাগহ্বর থেকে পৃথিবীর উপরিভাগে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে ঠিক তখনই জিয়োথারমাল সিসটেম বা উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির ধারে কাছের অগ্ন্যুৎপাত ছাড়াও উষ্ণ প্রস্রবণের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

ভূগর্ভে নিহিত এই বাষ্প টারবাইনে ঢুকিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলে। 'হিট-পাইপের' সাহায্যে মাটির অভ্যন্তরের এই উষ্ণ জল থেকে সরাসরি তাপ নিষ্কাশনের ব্যাপারটিও বিজ্ঞানীরা এখন বিবেচনা করে দেখছেন। কোনও কোনও উষ্ণ প্রস্রবণের রিজার্ভারের চাপ খুব বেশি থাকার জন্য সেখানকার জল ফুটতে পারে না। এখান থেকে জল কোনও ভাবে ছাড়া পেলে তীব্র জেটের আকারে বাষ্প ও লবণজল (ব্রাইন)-এর মিশ্রণ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এ থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সহজ।

উষ্ণ ঝর্ণার প্রস্রবণ মাটির উপরে উঠে আসেনি এমন অনেক জায়গায় গভীর ইঁদারা, কুয়ো থেকেও গরম জল ও বাষ্প বেরোতে দেখা গেছে। ভারতের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন গুজরাটের কাম্বে উপত্যকায় তেল নিষ্কাশনের সময় ভূ-অভ্যন্তরের 1,500 থেকে 2,000 মিটার গভীরে এই ধরনের উষ্ণ বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—আজ যখন আমাদের হাতের মুঠোয় পারমাণবিক শক্তি রয়েছে, তখন আবার খামোখা জিয়োথারমাল পাওয়ার নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার দরকারটা কি? এর উত্তর হচ্ছে—যে কোনও পাওয়ার সিস্টেম থেকে শক্তি পেতে হলে তার উৎপাদনের খরচের দিকে সবচেয়ে আগে নজর দিতে হবে। জিয়োথারমাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট তৈরি এবং তার বার্ষিক খরচ হিসাব করে দেখা গিয়েছে—এটা শুধুমাত্র সস্তাই নয়, এই প্ল্যাণ্ট তৈরি করতে মূলধনও লাগে সবচেয়ে কম।

জিয়োথারমাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট একবার তৈরি হয়ে যাবার পর প্রকৃত পক্ষে এতে জ্বালানির জন্য কোনও খরচই নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা পারমাণবিক শক্তি—যেটাই আমরা ব্যবহার করি না কেন এদের প্রত্যেকেই কিন্তু অলক্ষ্যে আমাদের চারপাশের আবহাওয়াকে দূষিত (Environmental pollution) করে চলেছে। জিয়োথারমাল পাওয়ার যেমন সস্তা—তেমনি পরিষ্কার, কারণ এর ব্যবহারে কার্বন-মনো-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড অথবা রেডিও এ্যাকটিভ বস্তু সমূহের কবলে পড়বার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

আমাদের ভারতেও জিয়োথারমাল পাওয়ারকে কাজে লাগানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 300টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এদের বেশির ভাগই চোখে পড়বে হিমাচল প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিম তটের বোম্বাই এবং রত্নগিরির মাঝামাঝি অঞ্চলে। মহারাষ্ট্রের তানসা নদীর কাছে ভজরেশভরী উষ্ণ প্রস্রবণটিও খুব বিখ্যাত। এদের অনেকগুলো প্রস্রবণ থেকেই ফুটন্ত জল এবং তার সঙ্গে বাষ্প বেরোয়। বিশেষজ্ঞেরা পুগা এবং কুলুর মানকরণ উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা বলেছেন। জিয়োথারমাল সিস্টেম থেকে শুধু যে কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে তাই নয় এর ব্রাইনকে (নুন-জলের মিশ্রণ) নানাবিধ খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশন এবং বিশুদ্ধ জল উৎপাদনের জন্যও কাজে লাগানো যাবে। তাছাড়া এই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে এটা হবে ভ্রমণকারীদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর দুখানি বই

মাটি থেকে আকাশে ১০·০০

বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

ভূমিকম্প

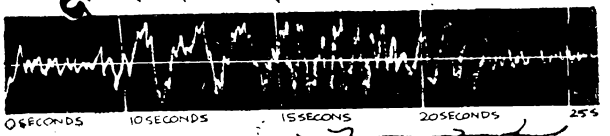

উদয়ন ভট্টাচার্য

ভূমিকম্প এক মহা-অনিশ্চিত অমোঘ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মুহূর্তের মধ্যে মানুষের তিল তিল পরিশ্রমের তৈরি সভ্যতার ইমারত এক প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ করে। আহত ও আশ্রয়চ্যুত হয় লক্ষ লক্ষ লোক। যতদূর জানা যায় খৃঃ পূর্ব চারশ-পঁচিশ সালে গ্রীসে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হয় এবং এর ফলে ইফেসাস (Ephesus) শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ভূমিকম্পের জন্য দায়ী অল্প-বিস্তর তিনটি কারণ। পাহাড়ের গা বা চূড়া থেকে বিরাট বিরাট ওজনের মাটি, শিলা ও বরফ সম্বলিত চাঁই খসে পড়ে। সেই ধস-নামা ভূমিকম্পের একটি কারণ। এছাড়া আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে নিদারুণ বেগে গলিত লাভা ইত্যাদি বেরিয়ে আসার সময় আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের ভূ-স্তরে প্রচণ্ড আঘাত করতে থাকে। সেই আঘাতেও ভূ-কম্পের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূ-কম্পের প্রধান কারণ হিসেবে ভূ-গর্ভের ভেতরে শিলাচ্যুতিকেই মনে করেন। পৃথিবীর ভেতরের অংশ পর-পর শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। ভূ-গর্ভের ভেতরে নানা প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় কোন কোন শিলাস্তরের দুপাশে টান পড়ে। এই টানের দরুন শিলাস্তরটি ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকে। বাঁকতে বাঁকতে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন সেটা আর স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না, হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। এই ঘটনারই নাম শিলাচ্যুতি। যে জায়গায় শিলাচ্যুতি ঘটে তার আশপাশের শিলাস্তরও কাঁপতে থাকে প্রবল বেগে। এই কাঁপনের ফলেই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। শিলাচ্যুতি ঘটে পার্বত্য-অঞ্চলে। বিশেষ করে ভঙ্গিল পর্বতমালায়। ভূ-পৃষ্ঠের নিচে যে জায়গায় ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাটিকে বলা হয় ভূকম্পন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের গভীরতা মোটামুটি ত্রিশ কিলো মিটারের ভেতর থাকে। সবচেয়ে গভীর ভূ-কম্পন কেন্দ্রটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এর গভীরতা প্রায় চারশ পঞ্চাশ কিলো মিটার।

শিলা-দেহে আলোড়ন সৃষ্টি হলে পৃথিবীতে যে কাঁপন জেগে ওঠে, সেই কাঁপনের তীব্রতা মাপা হয় সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে। এই যন্ত্র বলে দেয় কোন্ ভূ-মিকম্পের ভূ-কম্পন কেন্দ্র ঠিক কোন জায়গায়, আর তার তীব্রতাই বা কতখানি। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে যে স্কেল বসানো থাকে, তাতে দশটি ভাগ থাকে—এক থেকে দশ পর্যন্ত। কালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক সি. এফ. রিকটার এর নাম অনুসারে এই স্কেলের নাম রিকটার স্কেল। সর্বধ্বংসী যে ভূমিকম্প তার তীব্রতার মাপ এই স্কেলে সাড়ে আট থেকে নয় পর্যন্ত উঠতে দেখা গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভূ-কম্পনের পর্যবেক্ষণাগার রয়েছে। সেই সব পর্যবেক্ষণাগার থেকে আজ পর্যন্ত অন্যূন ত্রিশলক্ষ বার ভূ-কম্পনের কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভূ-কম্পন বিশেষজ্ঞরা সমীক্ষা নিয়ে দেখেছেন গড়ে প্রতি বছরে অন্ততঃ একটি করে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। তাঁদের সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় যে, পৃথিবীর ভূ-কম্পন প্রবণ-এলাকাগুলোতে গড়ে প্রতি মিনিটে প্রায় দু'বার করে ভূ-কম্পন হচ্ছে।

গত দেড়শ-দু'শ বছরে দেখা গেছে বেশিরভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে দু'টো পার্বতমালার সন্নিহিত অঞ্চলে—একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিমণ্ডল—প্রশান্ত মহাসাগরকে বলয় করে যেসব অঞ্চল। দ্বিতীয়টি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু হয়ে হিমালয় আর এশিয়া মাইনর পার হয়ে এই অঞ্চল আল্পস পর্বতশ্রেণীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই অঞ্চল দু'টোর মধ্যে পড়ে ইতালি, গ্রীস, তুরস্ক, ইরান, ভারতের উত্তরাংশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম-পার্বত্য অঞ্চল এবং মধ্য আমেরিকা। আঠারো'শ সাতানব্বই ও উনিশ'শ পঞ্চাশ সালে আসামের ভূমিকম্প, উনিশ'শ পাঁচ-সালে কাংড়ার ভূমিকম্প, উনিশশ' চৌত্রিশ-সালে বিহারের ভূমিকম্প দ্বিতীয় বলয় অর্থাৎ ভূ-মধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল থেকে উত্থিত।

ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এর আকস্মিকতায় হত বিহবল মানব জীবনে নেমে আসে মৃত্যুর বিভীষিকা। ভূমিকম্পের গতিবিধি সম্পর্কে একটু আঁচ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ—অন্ততঃ প্রাণহানির

পরিমাণ বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়নি যার মাধ্যমে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা ঘোষণা করা যায়।

ভূমিকম্প সম্পর্কে আগাম সতর্কবাণী দেয়া কি সম্ভব? ব্যাপারটা পুরোপুরি বিতর্কিত। সম্প্রতি ইতর প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ আসন্ন ভূমিকম্পের বার্তা বলে অনেকে মনে করছেন। এর পেছনে যথেষ্ট সত্যতাও রয়েছে। অতি সম্প্রতি টোকিও ইন্সটিটিউট্ অব্ টেক্নলজি'র অধ্যাপক টসুনেজি (Tsuneji) জাপানে এবং জাপানের বাইরে সাতচল্লিশটি ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণের একশ সাতান্নটি ঘটনার যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ— করেছেন। আঠারো'শ একানব্বই সালে নোবি'র (Nobi) ভূমিকম্পের আগে হঠাৎ ইঁদুরেরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। উনিশ'শ তেইশ সালে জাপানের কানটো'র ভূমিকম্পের আগে ক্যাটফীস (Catfish) নদী থেকে তীরে লাফিয়ে উঠতে শুরু করে। অধ্যাপক টসুনেজি ইতর প্রাণীর এসব অস্বাভাবিক আচরণ-ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে মনে করেন।

বিশ্বের সর্বাধিক ভূকম্পন পীড়িত দেশ চীন। চীনের সমগ্র এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূ-কম্পন প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। ফলে ভূমিকম্প ভীতি চীনা জনগণের এক স্বাভাবিক ঘটনা। চীনের জনগণ ইতর প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ভূমিকম্পের আগাম বার্তাটি গ্রহণ করতে মোটামুটি সক্ষম। দীর্ঘদিন ধরে ইতর প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণ অনুশীলন করে তারা আসন্ন বিপদের গন্ধ মোটা-মুটি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। 1975 এবং 1979 সালে ফুকিয়েন (Fukien) এবং লিয়ং (Liaoing) প্রদেশের প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আগাম ব্যবস্থাদি নেওয়াতে ভূমিকম্পজনিত ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, মাছ, কীট-পতঙ্গ ভূমিকম্পের অনেক আগেই বিপদের গন্ধ টের পায়। পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে, ভূমিকম্পের তিন ঘণ্টা থেকে চারদিনের ভেতর এদের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলো পরিলক্ষিত হয়। ভূমিকম্পের আগে গরু ঘোড়া তাদের বাসস্থানে ঢুকতে চায় না, ইঁদুর ও সাপ তাদের আবাসস্থল ছেড়ে পালায় এবং মাছ ভয়ে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে।

ভূ-গর্ভস্থ জলের লেভেলের পার্থক্য দেখে কেউ কেউ ভূমিকম্প-সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। দেখা গেছে, কুয়োর জলের গভীরতা এবং উষ্ণতার পরিবর্তন দেখে ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রে সঠিক হয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতীতের পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় 1720 সালে দিল্লীতে, 1737 সালে কোলকাতায় 1762 সালে বাংলাদেশে, 1814 এবং 1819 সালে কোচ-এ (গুজরাট), 1885 সালে বাংলা ও কাশ্মীরে, 1897, 1950 এবং 1975 সালে আসামে, 1905 সালে শংড়ায় 1934 সালে বিহার ও নেপালে এবং 1935 সালে বেলুচিস্তানে ভূমিকম্পের জন্য প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ইণ্ডিয়ান মীটিয়রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার হলো ভারতের ভূ-কম্পন গবেষণার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এছাড়াও ভারতে একশ'টির মতো ভূ-কম্পন গবেষণাগার রয়েছে। রুরকী এবং কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-কম্পন সম্পর্কে পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ইডিকি প্রজেকট্ (কেরল), টেহরী নেট ওয়ার্ক (উঃ প্রদেশ), গুজরাট নেটওয়ার্ক, কয়না নেটওয়ার্ক (মহারাষ্ট্র) প্রভৃতি স্থানে ভূ-কম্পন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালানো হচ্ছে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার মতো এখনো কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। আর প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ ধারা থেকে এমন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছান সম্ভব হয়নি যার মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে কোন অনাগত ভূমিকম্পের দিনক্ষণ বলা সম্ভব। আমরা আশাবাদী। পৃথিবী জুড়ে গবেষণা চলেছে। একদিন না একদিন যন্ত্র আবিষ্কার হবেই। এবং সেই যন্ত্র মাধ্যমে আমরা অনাগত ভূমিকম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারবো।

ভূমিকম্পের ফলে বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর সংখ্যা

সাল	দেশ	মৃত্যুর সংখ্যা
1556	সানসি (চীন)	1,30,000
1755	লিসবন (পর্তুগাল)	60,00
1905	কাংড়া (ভারত)	20,000
1908	মেসিনা (ইতালি)	1,00,000
1920	কানসু (চীন)	1,00,000
1923	কানটো (জাপান)	1,00,000
1935	কোয়েটা (পাকিস্তান)	30,000
1970	পেরু	50,000
1976	তাংসেন	7,00,000

[তথ্যসূত্র ঃ Science Reporter, Nov. '84
Science Today, Jan. '85]

পলাশবাড়ি, পোঃ আলিপুর দুয়ার
জেলাঃ জলপাইগুড়ি—736121

বুদ্ধি শুদ্ধি

টিপ ছাপ

হাতের ছাপই হল একটা মস্ত পরিচয় চিহ্ন যা পুলিশকে বা গোয়েন্দাকে অপরাধী ধরতে সাহায্য করে। প্রথমত আশ্চর্য ভাবে প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপেরই কিন্তু আলাদা চেহারা। আঙ্গুলের ডগায় সূক্ষ্ম রেখার সমন্বয়ে যে প্যাটার্ন বা নক্সা তৈরি হয় তা পৃথিবীর কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষেরই হুবহু এক হয় না। এমন কি কোন যমজ ভাই বোনদের ক্ষেত্রেও নয়। দ্বিতীয়ত তোমার আঙ্গুলের ছাপ কিন্তু কখনোই বদল হবে না। তুমি যত বড় ছদ্মবেশী হও আর যত বয়স্কই হও না কেন তোমার আঙ্গুলের ছাপই তোমার সারা জীবনের পরিচয়। অনেক অপরাধী নিজের আঙ্গুলের ডগার চামড়া পুড়িয়ে ফেলেও দেখেছে। ফল হয় নি। কিছুদিন বাদে নতুন চামড়া গজাবার পর যে কে সেই। তুমি কিন্তু বাড়ির কয়েকজনের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আঙ্গুলের ছাপের ধরন পাশের ছবিতে দেখে নাও।

পুলিশদের কাছে ছাপের ধরন চার রকম। (ক) খিলান জাতের, (খ) দড়ির ফাঁস, (গ) ঘূর্ণি বা গোলাকার, (ঘ) মিশ্র

খিলান ঃ এই জাতীয় নক্সাকে খিলান বলা হয় কারণ এর মধ্যিখানে খিলানের মত চেহারা হয়। পার্শ্ববর্তী রেখাগুলোও খিলানের মত।

ফাঁস ঃ মাঝখানে লম্বাটে দড়ির ফাঁসের মত চেহারা। এই জাতীয় চেহারায় ফাঁসের কিছু দূরে থাকবে ব-দ্বীপের মত নক্সা। রেখাগুলো ফাঁসের রেখাকে অনুসরণ করে বাড়তে বাড়তে ব-দ্বীপের মত জায়গায় গিয়ে মিশবে।

ঘূর্ণি বা গোলাকার ঃ ঘুরতে ঘুরতে রেখাগুলো মাঝখানে এসে গোল। এই চেহারায় ব-দ্বীপের মত নক্সা থাকবে দুটি। আর তা থাকবে দুপাশে।

মিশ্র ঃ আগের তিনটি মিশ্রণে নানান নক্সা হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ডবল ফাঁস। মাঝখানে ফাঁসির লেজ বেঁকে পরস্পরের মুখের দিকে ঘুরে যায়।

তা আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই ধারণা হয়ে গেল? এখন এ নিয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারো ইচ্ছে হলে। ইচ্ছে না হলে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে দিয়ে মজার সব ছবিও বানাতে পারো। দ্যাখো কী করবে।

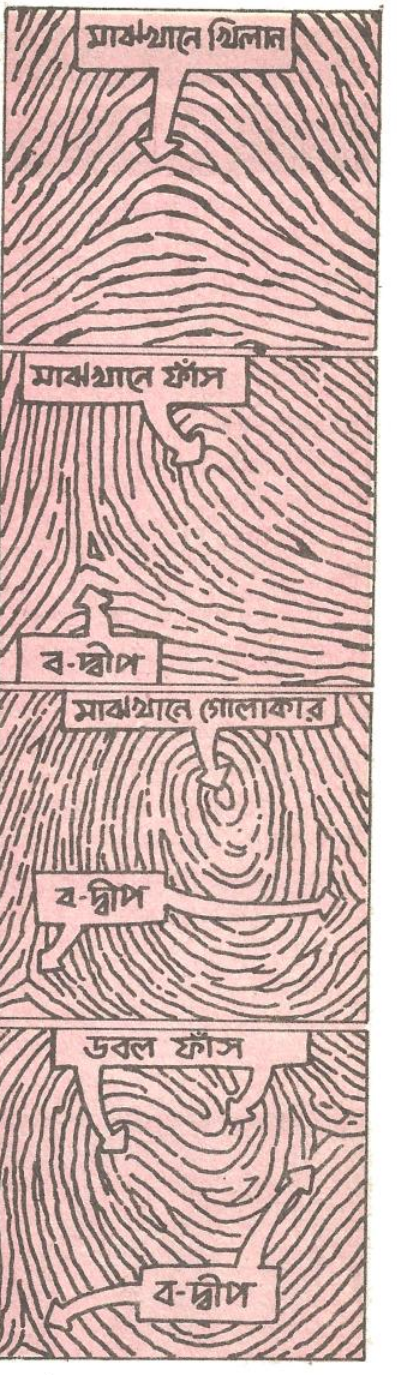

লেখা ও ছবি ঃ সমীর মণ্ডল

গত সংখ্যার বুদ্ধিশুদ্ধির উত্তর ঃ 59টি পায়রা। কিন্তু প্রথমটার মতো অত সহজে এটার সমাধান হবে না। দেখা যাক কি ভাবে বিক্রির ব্যাপারটা চলছে। প্রথমবারে বিক্রি হচ্ছে মোট পায়রার অর্দ্ধেক এবং আধখানা পায়রা। মানে $59 \div 2 = 29\frac{1}{2}$ এর সঙ্গে $\frac{1}{2}$ খানা পায়রা অর্থাৎ $29\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 30$টি পায়রা। তাহলে অবশিষ্ট রইল $59 - 30 = 29$টি পায়রা। দ্বিতীয় বারে অবশিষ্ট পায়রার তিন ভাগের একভাগ এবং $\frac{1}{3}$ অংশ পায়রা। অর্থাৎ $29 \div 3 = 9\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$ টি পায়রা—অর্থাৎ 10টি পায়রা। তাহলে অবশিষ্ট রইল $29 - 10 = 19$টি পায়রা। তৃতীয় বার $19 \div 4 = 4\frac{3}{4}$ এবং $\frac{1}{4}$টি পায়রা। অর্থাৎ $4\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 5$টি পায়রা। অবশিষ্ট রইল $19 - 5 = 14$টি পায়রা। আর চতুর্থবার $14 \div 5 = 2\frac{4}{5}$ এবং $\frac{1}{5}$ অর্থাৎ 3টি পায়রা। তাহলে অবশিষ্ট থাকে? $14 - 5 = 11$টি পায়রা।

গ্রেড I

VII-VIII জুলাই 87

1. রুমেনিগে' কোন দেশের ফুটবল খেলোয়াড় ?

2. কলাগাছ কোন্ জ্ঞাতীয় উদ্ভিদ ?

3 ফুসফুসের ভেতরকার বুঠরী-গুলিকে কি বলে ?

4 প্রাচীন মিশরের প্রথম রাজ-ধানী ছিল কোথায় ?

5. ফিউড FEUD কথার অর্থ কি ?

6. জড় পদার্থ ও শক্তির পরস্পর রূপান্তর যে সম্ভব, তা কোন্ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন ?

7. উনানে কয়লার দহন হওয়া, ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন ?

8. আইসল্যাণ্ডে একটি আগ্নেয়-গিরি আছে। তার নাম কি ?

9. কলকাতার দ্রাঘিমা কতো ?

10. এটি কিসের ছবি ?

গ্রেড II

IX-X জুলাই 87

1. সেলেনিয়াম ধাতুর উপর আলো ফেলা হলো। এক্ষেত্রে ধাতুটির রোধ বাড়বে, না কমবে ?

2. পর্যায় সারণীর কোন্ পর্যায়ের মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় ?

3. 'ঢাকা' কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ?

4. পাকিস্তানের প্রধান নদীর নাম কি ?

5. 'শিল্পাদিকরম' কিসের নাম ?

6. বাহাদুর শাহ ক'বছর রাজত্ব করেছিলেন ?

7. একটি ট্রাইটিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রে কটি নিউট্রন থাকে ?

(ক) 1 (খ) 2 (গ) 3

8. একটি ফসফরাস অণু ক'টি পরমাণু দ্বারা গঠিত ?

9. পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথরের মন্দির কোনটি ?

10. এটি কোন্ বিজ্ঞানীর ছবি ?

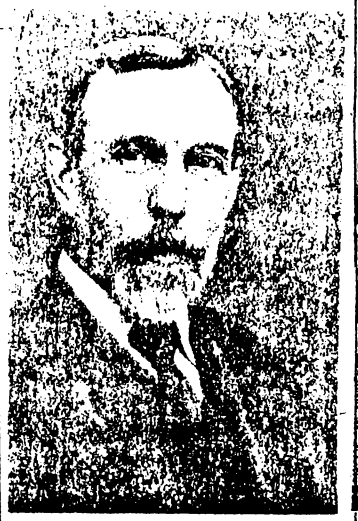

গ্রেড III

XI-XII জুলাই '87

1. প্রাণিবিজ্ঞানে সোনা ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি ?

2. যে লেন্সের ক্ষমতা 2 ডায়-পটার, তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কতো ?
(ক) 20cm (খ) 25cm (গ) 50cm

3. এবোনাইটকে রজন দ্বারা ঘষলে এবোনাইটে কিরূপ তড়িৎ উৎপন্ন হয় ?

$_3Li^6$ এবং $_3Li^7$ লিখলে কি বুঝতে হবে ?

5. সেতার, গিটার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রে ফাঁপা কাঠের বাক্স থাকে কেন ?

6. $\frac{\text{ওয়াট} \times \text{ঘণ্টা}}{1000} = ?$

7. 'অ্যাথলিট্স ফুট' নামক রোগটি নিচের কোন্‌টি দ্বারা সৃষ্টি হয় ?

(ক) ব্যাকটিরিয়া (খ) ফাঙ্গাস
(গ) ভাইরাস

8. ভারতে যে সব হরিণ বাস করে তাদের মধ্যে বৃহত্তম কোন্‌টি ?

(ক) চিতল (খ) সম্বর
(গ) নীলগাই

10. এটি একটি বিখ্যাত জল-প্রপাত। এর নাম কি ?

শব্দকূট

তাপস বেরা

সংকেত—পাশাপাশি

1. লুই পাস্তুরের সমসাময়িক একজন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী।
3. যে মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' বর্তমান।

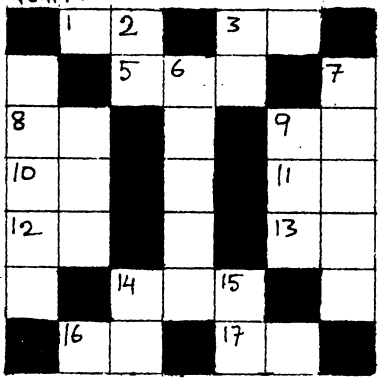

5. হাঁসের একটি উন্নত প্রজাতি
8. রজনী। 9. সোরিয়া রোবাস্টা—যে উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম। 10. ক্লোরিনের আবিষ্কর্তা। 11. তলো-য়ার। 12. উকুনের ডিম, নিকি! 13. স্ত্রী। 14. কপি। 16. ক্যাসিওলাস মুংসো যে উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম। 17. গরল

সংকেত—উপরনিচ

2 বৃষ্টিহীনতা 3. হস্ত। 4. যে ঔষধের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। 6. বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে যে গ্যাসকে 'অ্যাজোট' নামে অভিহিত করেন। 7. যে ধাতু রঙের অম্লতা প্রশমিত করে।
14. ছারপোকার ইংরেজী শব্দ। 15. সূর্য

সমাধান আগামী সংখ্যায়

আই কিউ টেস্ট জুলাই 1987

1. কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি বছরে শতকরা দুই হয়, তবে ঐ দেশে বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে—
   (a) 50 বছরে, (b) 40 বছরে, (c) 35 বছরে, (d) 30 বছরে।
2. পরবর্তী সংখ্যা কত হবে—
   18 20 24 32 ?
3. কোন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায়—
   (a) কোন ভরসংখ্যা সংরক্ষিত হয়, (b) কেবল পারমাণবিক সংখ্যা সংরক্ষিত হয় (c) ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক সংখ্যা উভয়ই সংরক্ষিত হয়।
4. ক্লোরিনের যোজ্যতা নিচের কোনটির যোজ্যতার সমান (ক) অক্সিজেন, (b) অ্যালুমিনিয়াম, (c) লিথিয়াম।
5. ডয়টোরিয়ামের আবিষ্কর্তা কে—
   (a) হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ, (b) হ্যারল্ড ইউরে, (c) জোসেফ প্রিস্টলী।

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

মে, 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সমাধান

1. জিয়োফ্রে চসার। 2. আয়রন, নিকেল ও প্লাটিনাম ধাতু। 3. পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত। 4. 35 টি। 5. সীসা ও দস্তার খনি। 6. 1930 খ্রীস্টাব্দে। 7. ব্যাকরণ শাস্ত্রে পণ্ডিত হিসাবে। 8. 20 কিলোগ্রাম। 9. বোসন। 10. নন্দলাল বসু।

মে, 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 2-এর সমাধান

1. অতি সূক্ষ্ম বালুকণা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হয়ে যদি বহু দূরে সঞ্চিত হয়, তবে তাকে 'লোয়েস' বলে। 2. সুলতানী যুগের একজন বিখ্যাত সুফী ধর্মসাধক। 3. একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার-এর নাম। 4 এক সেণ্টিমিটার। 5. স্পোর। 6. স্বর (note) বলে। 7. প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন। 8. আলাউদ্দীন খিলজী। 9. বিশ্বাস ও বীরত্বের প্রতীক। 10. ডন ব্র্যাডম্যান।

মে 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 3-এর সমাধান

1. পয়লা এপ্রিল, 1973 খ্রীস্টব্দে। 2. চেকোস্লো-ভাকিয়ার নাগরিক, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। 3. সোভিয়েত রাশিয়া। 4. উলার হ্রদে। 5. লিথিয়াম। 6. 21 দিনে। 7. ইস্পাত। 8. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। 9. HERPETOLOGY. 10 রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিয়েভ।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট মে 1987-এর সমাধান

1. (a) Chief Commissioner, (b) His (Her) Highness, (c) Table Tenis, (d) Ku Klux Klan. 2. (b) 14 মাইল পূর্ব। 3. (a) বরফ। 4. (d) ক্রনোমিটার 5. (a) ক্যাসিটেরাইট।

শব্দকূট সমাধান

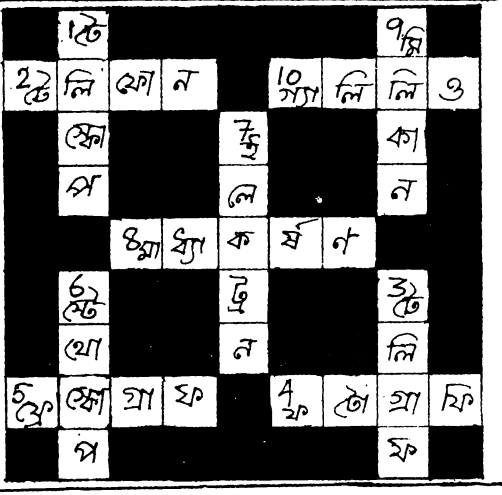

এলিভেটর

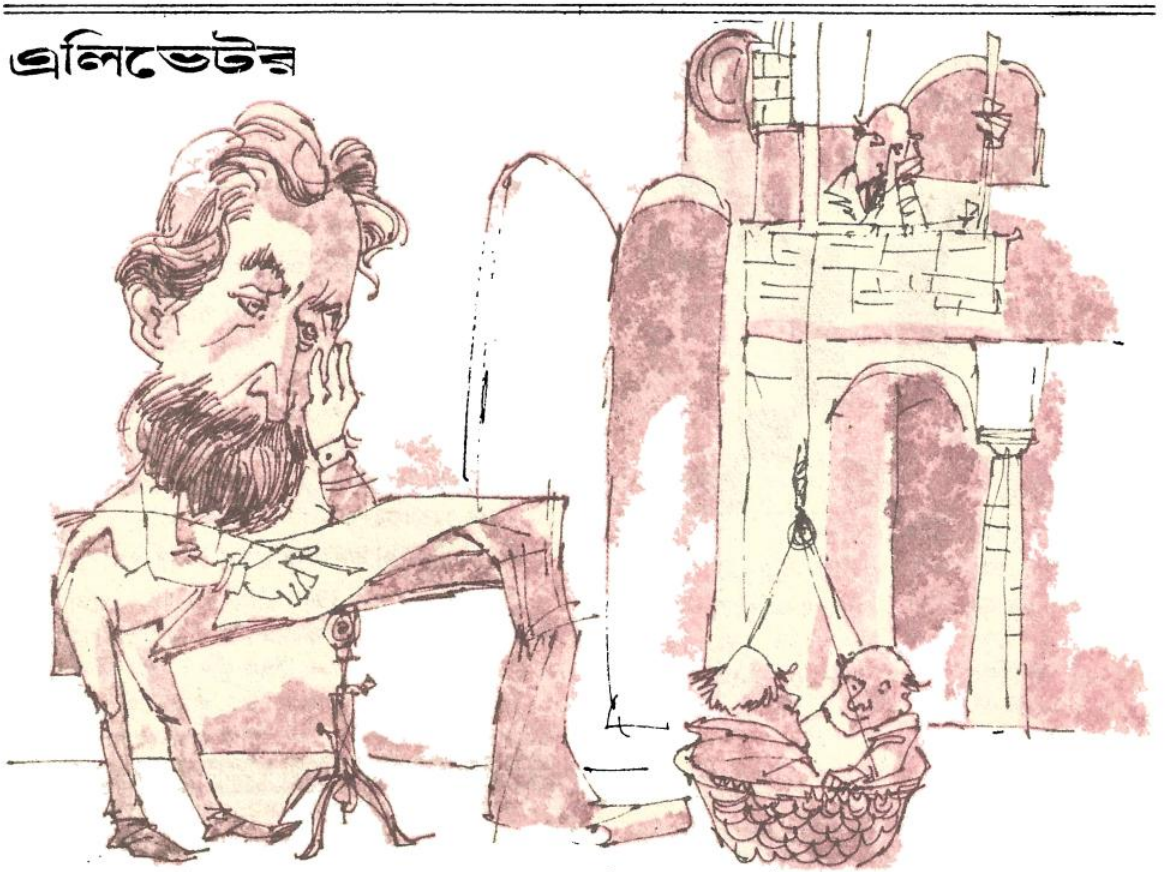

আজকালকার বাচ্চারা বোধ হয় আর কোন কিছুতেই আশ্চর্য হয় না। আমার বেশ মনে আছে, আমি বেশ বড় বয়স অবধি এলিভেটরে চড়লে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আর জিজা সেদিনের মেয়ে। এরই মধ্যে সে ওই সামনের মাল্টিস্টোরিড বাড়িটায় বিকেলবেলা চোরচোর খেলতে যায় আর লিফটে চড়ে এস্তার ওপর নীচ করে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁরে তোর ভয় করে না?' জিজা ঠোঁট উল্টে উত্তর দিল 'ভয় করবে কেন?' তোমরাও হয়ত তাই ভাবছ, লিফটে চড়তে ভয় করবার কি আছে।

কিন্তু আজ থেকে অনেক বছর আগে লোকের কিন্তু তাই মনে হত। তখন (সে প্রায় মধ্যযুগের কথা) গীর্জা থেকে দড়িতে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়া হল ঝুড়ি। তাতে চেপে লোক উঠে আসত কিম্বা আসত খাবার-দাবার। কি সাংঘাতিক বলতো।

অবশ্য এরকমটি আর বেশিদিন রইল না। এলিনা জি ওটিস 1889 খ্রীস্টাব্দে অনেক নিরাপদ এক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা তৈরি করলেন।

লিফট আসলে একটা বাক্সের মত। একটা কপিকলে তার জড়ানো থাকে, ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে সেই তার ওঠানো নামানো যায়। লিফটও ওঠে, নামে সেই ভাবে। ধর, কোন একটা তলায় যাবে বলে বোতাম টিপলে, বাক্সটা যেই না সেই তলায় পৌঁছল অমনি ইলেকট্রিক মোটর থেমে যায়। বাক্সের ওজনটা ব্যালেন্স করার জন্য তারের উল্টো-দিকে একটা ওজন লাগানো থাকে। লিফট তাই সোজা ওঠে, রেল বেয়ে।

বাইরে বেল বজল। দরজা খুলতেই হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকল জিজার দিদি। কিরে হাঁফাচ্ছিস কেন?' আর বোলো না কাকু, জিজার দিদি বলল পিয়াদের বাড়ির লিফটটা খারাপ। ওকে ডাকতে গেছিলাম, ও বাড়ি নেই। সাততলা আমায় সিঁড়ি বেয়ে শুধু শুধু উঠতে আর নামতে হল।'

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

গত সংখ্যায় ভ্রমবশতঃ আই কিউ-টেস্টের সফল উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশিত হয় নি। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। প্রশ্ন ও উত্তরের সংখ্যাতেও কিছু গরমিল ছিল। এই সংখ্যায় এপ্রিল '87 সংখ্যার সকল আই কিউ টেস্ট প্রতিযোগীদের নাম প্রকাশ করা হল। নতুন করে যে কুইজ কনটেস্ট গ্রেড I, II, III-এর প্রবর্তন করা হয়েছে এ সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারোনি। তাই সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর-দাতাদের মধ্যেই নির্বাচন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-কারীদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তারা যেন 'বলতে পারো কেন' চিঠিপত্র বা প্রতিযোগিতার উত্তর একই খামে না পাঠান। বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনাম অবশ্যই খামের ওপরে লেখা থাকা দরকার। বার্ষিক অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত সফল প্রতিযোগীদের অনুরোধে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট সমূহ আরও একমাস (31 জুলাই '87) দপ্তরে রাখা হবে। যারা এখনও সংগ্রহ করতে পারোনি তারা অবিলম্বে সংগ্রহ করে নাও।

পরিচালক ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

মে '87-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **জয়ন্ত ধর** 15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-700 003। 2. **সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ**, জয়রামপুর, শুকদেবপুর, দক্ষিণ 24-পরগনা 743503। 3. **মহুয়া ঘোষ**, প্রযত্নে, পি. এস. ঘোষ, 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-700 054। 4. **শুভ্রদীপ দাস** প্রযত্নে, চন্দ্রকান্ত দাস, ভুবনভড় রোড, ভাকুণ্ডা, চন্দননগর, হুগলী। 5. **সৌগত দত্ত** প্রযত্নে, কল্পনা দত্ত, পোঃ বুড়ো শিবতলা চুঁচুড়া, হুগলী-712105। 6. **অরূপ সিংহ** প্রযত্নে, বীরেন্দ্রনাথ সিংহ, ফুড এণ্ড সাপ্লাই অফিস, কাঁথি, মেদিনীপুর। 7. **কৌশিক বাগচি** প্রযত্নে, অনীতা ঘোষ, 26/1, ভানরি লেন, বেলঘরিয়া, কলকাতা-700 056। 8. **স্নিগ্ধা উপাধ্যায়** 2/29, শান্তিপথ, সি-জোন, দুর্গাপুর-5। 9. **দীপক কুমার বাগ** প্রযত্নে, সুধাংশু শেখর বাগ, গ্রাম—খালোড়, (বাগনান কলেজ রোড) পোঃ বাগনান, হাওড়া। 10. **মিনতি ঘোষ** জয়রামপুর, শুকদেবপুর, দক্ষিণ 24-পরগনা 743503।

** এপ্রিল '87-এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ প্রকাশিত হয় নি। জুলাই '87 সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা হলো। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—পরিচালক ছোটদের দপ্তর

এপ্রিল '87-এ প্রকাশিত আই কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **অশোক বিশ্বাস** হরিণডাঙ্গা, বগুলা, নদীয়া। 2. **কল্লোল রায়** প্রযত্নে, মুকুল চন্দ্র রায়, পোস্ট—গঙ্গারামপুর (হাইরোড), জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর 733124। 3. **অমিতাভ জানা** গ্রাম+পোস্ট—বয়াল, জেলা—মেদিনীপুর 721656। 4. **দিগন্ত ভট্টাচার্য** 100/6, এম. সি. ঘোষ লেন হাওড়া—711 101।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **কৌশিক বাঘওী** 15/31A, বনমালী ঘোষাল লেন, কলকাতা-700 034। 2. **সৌমেন চ্যাটার্জী** 176/4, শিবপুর রোড, হাওড়া-2। 3. **সংহিতা চৌধুরী** কো. নং—এল. আর 251, এ. বি. এল. কলোনী দুর্গাপুর-6, বর্ধমান—713206।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

হাওড়া ঃ ডরোথি ঘোষ। **বর্ধমান ঃ** প্রণবেন্দু কুণ্ডু। **মেদিনীপুর ঃ** প্রদীপ দাস।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II--এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **দীপঙ্কর ব্যানার্জী** E-4/1, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-700 091। 2. **সিদ্ধার্থ দাস** প্রযত্নে, প্যারীমোহন দাস, গুসকরা পি. পি. ইনস্টিটিউশন, গুসকরা, বর্ধমান। 3. **নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত** প্রযত্নে, তরুণ সেনগুপ্ত, 69/1, নন্দনকানন, পোঃ—হিন্দমোটর, হুগলী।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ মল্লিকা ভট্টাচার্য, বর্ণালী সেনগুপ্ত, শ্রাবণী দাশ, অনিন্দ্য দাস, শুভঙ্কর ব্যানার্জী, ইন্দ্রশ্রী জানা, অমিতাভ চ্যাটার্জী, রাজেশ ভট্টাচার্য। **24-পরগনা ঃ** সুকান্ত মণ্ডল, সৌমেন ভৌমিক, সেখ বসিরুল ইসলাম, সুমন ঘোষ, সুমন নন্দী, সুব্রত ঘোষ দস্তিদার, মিনতি ঘোষ। **হাওড়া ঃ** সৈকত বিশ্বাস। **হুগলী ঃ** কন্যাশ্রী মুখোপাধ্যায়। **বর্ধমান ঃ** ইন্দ্রনীল চৌধুরী, ধীরাজ কুমার ব্যানার্জী, সেখ আবু মহঃ সাবীর, আশিস মণ্ডল, নিলয় কুমার হাজরা, সুমন কুমার কর্মকার, বিজয় কুমার দাস। **মেদিনীপুর ঃ** অপরাজিতা দত্ত মজুমদার অর্ঘ্য মান্না। **বীরভূম ঃ** পূর্বালী হালদার। **পঃ দিনাজপুর ঃ** সৌমিত দাস।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারে নি।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দুজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **কুন্তলা কোলে** প্রযত্নে, রাধাকান্ত কোলে, গ্রাম + পোঃ—বাজেমেলিয়া ভায়া—নালিকুল, জেলা—হুগলী। 2. **চঞ্চল বসু ঃ** 27/4, এন. সি. সেন লেন, হাওড়া-6।

মে '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সর্বাধিক আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে ঃ

বর্ধমান ঃ শান্তিনাথ গুঁই, তাপস সোম। **বীরভূম ঃ** চন্দন মুখোপাধ্যায়।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান কেন্দ্র আয়োজিত
প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

প্রবন্ধের বিষয় ঃ (1) বিজ্ঞান ক্লাব গঠনে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা অথবা (2) সমুদ্র ও মানুষ ॥ শব্দসংখ্যা 800-1000।

বক্তৃতার বিষয় ঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরিবেশ কোন পথে যাচ্ছে। সময় ঃ সাত মিনিট।

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে কোন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিযোগিতার আবেদন পত্রের সঙ্গে বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষরিত পরিচয় পত্র পাঠাতে হবে। আবেদন ও রচনা পাঠানোর শেষ তারিখ 20 জুলাই। 1987।

যোগাযোগ করতে হবে

আশিস মান্না

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান কেন্দ্র, পোঃ মেচেদা, মেদিনীপুর, 721 137

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI-VII VIII, IX-X ও XI-XII। ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10 টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জুলাই সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড—1

অমরনাথ রায়ের

কেমিস্ট্রি ক্যুইজ

গ্রেড—2

সমরজিৎ করের

পরমাণু গবেষণায় ভারত

গ্রেড—3

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর গল্প সমগ্র

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

ঠিকানা.....

.....

বয়স ..... শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম.....

.....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

চোর তাড়ুয়া

রাজেশ গিরি

সেদিন সকালে বিপ্লব এসে খবর দিল, ওদের গ্রীল গেটের তালা ভেঙ্গে চোর ঢুকেছিল তবে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠায় বেশি কিছু নিতে পারে নি, বিপ্লবের সাইকেলটই নিয়ে গেছে। বিপ্লব আমাকে বলেছিল 'এমন একটা যন্ত্র বানাতে পারবি যাতে চোর বাড়িতে ঢুকবার আগেই বোঝা যাবে চোর এসেছে?' বিপ্লবের কথা শুনে সামান্য খেটে খুটে যে সার্কিটটা তৈরি করলাম তা অনেকের সুবিধার জন্য 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এ পাঠিয়ে দিলাম।

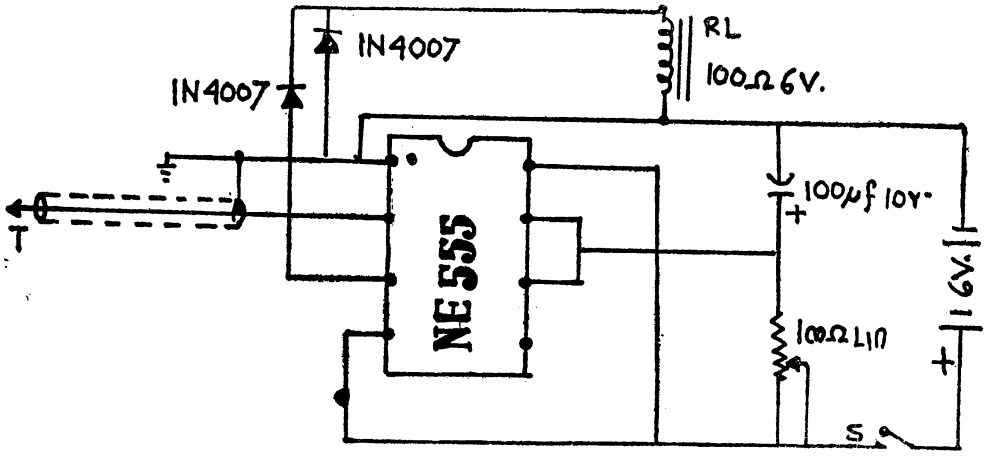

এই সার্কিটের হৃৎপিণ্ড হল একটা টাইমার IC (NE 555)। এই যন্ত্র কিভাবে চোর তাড়াবে তা বলি—IC 555-এর ট্রিগার টার্মিনাল (2) থেকে একটা তার তালার সাথে যোগ করতে হবে। S সুইচ অন্ করে তালাটাকে স্পর্শ করলে আমাদের শরীরে যে ·7 ভোল্টের বেশি কারেণ্ট থাকে তা IC-র ট্রিগার অন্ করে, ফলে রিলে অন্ হয়। এবং এই অন্ হয়ে থাকার সময় নির্দিণ্ট করা যাবে 1M-এর পোটেনশিওমিটারটা ঘুরিয়ে। আমার যন্ত্রে আমি রিলের সাথে একটা টেপ রেকর্ডার জুড়ে দিয়েছিলাম, তার ক্যাসেটে 15 সেকেণ্ডের জন্য 'চোর-চোর' কথাটা রেকর্ড করে। তবে তোমরা একটা কলিং বেল লাগাতে পার।

ঝাল দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ডাই সোল্ডারিং না হয় কম্পোনেন্টগুলো যেন ঠিক মত লাগানো হয়, IC তে তাপ ও আঘাত যেন না লাগে। নয়ত যন্ত্র কাজ করবে না IC গরম হবে।

দশম শ্রেণী, ঝাড়গ্রাম কুমুদ কুমারী বিদ্যালয়, মেদিনীপুর

হাতছানিতে এলো রঙ

অপরাজিত বসু

জল ঘেঁটে কি কখনো জলে রঙ ধরানো যায়? ধরো, এক বালতি জল—দোলখেলার লাল রঙ চাও? জলে হাত ডুবিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে কি লাল রঙ আসবে? না। কিন্তু দেখ, একটা নতুন উপায়ে কি করে আমি জলের রঙ আনাই।

একটা বড় সাদা এনামেলের গামলা নাও, তাতে ঢাল পরিষ্কার জল। গামলা ভর্তি টলটলে জলে এবার এক চামচ চুনের জল মিশিয়ে দাও। তারপর তিন-চার ফোঁটা মিথিলিন-ব্লু মেশাও (এই পদার্থটি একটু কষ্ট করে কেমিক্যালস্-এর দোকান থেকে জোগাড় করতে হবে)। জলটা ঘেঁটে দিলে দেখবে চমৎকার সবুজ রঙের জল হয়েছে। আলাদা একটা কাচের গ্লাসে খানিকটা ফ্রুকটোসের জলীয় দ্রবণ তৈরি কর। ফ্রুকটোসের দ্রবণটা এবার গামলার জলে ঢেলে দাও। দেখ, গামলার সবুজ জল রঙ হারিয়ে সাধারণ জলের মতো দেখাচ্ছে।

গামলায় হাত ডুবিয়ে ভালো করে জল ঘাঁটো, পারলে ফেনা তৈরি করো। কি আশ্চর্য, যে জল সাধারণ রঙ শূন্য ছিল তাতে আবার সবুজ রঙ ফিরে এসেছে। যাক, রঙ যখন ফিরে এসেছে তখন নিশ্চিন্ত। হাত তুলে বিশ্রাম নাও। ওমা, জলের সবুজ রঙ যে আবার চলে যাচ্ছে, জল যে আবার রঙহীন হয়ে গেল।

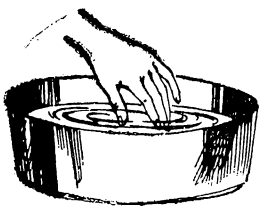

কোন ভয় নেই। আবার জল ঘাঁটো, জল সবুজ হয়ে গেল, হাত তুলে নাও, রঙ চলে গেলো। জল ঘাঁটো—রঙ এলো, হাত তোল—রঙ চলে গেলো। কি মজার খেলা তাই না?

কেন এমন হয়? সবই কেমিস্ট্রির খেলা।

চুনের জলে মিথিলিন ব্লু দিলে যে সবুজ রঙ হয় তা ফ্রুকটোস তাড়িয়ে দেয়, কারণ ফ্রুকটোস বিজারিত করে মিথিলিন ব্লু'কে। বিজারিত মিথিলিন ব্লু-এর কোন রঙ নেই; হাত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে বাতাস জলে ঢোকে, বাতাসের অক্সিজেন বিজারিত মিথিলিন ব্লু-কে জারিত করে রঙ ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু ফেলে রাখলে ফ্রুকটোস আবার তাকে বিজারিত করে রঙ তাড়িয়ে দেয়। জিনিসগুলি একটু কষ্ট করে জোগাড় করে পরীক্ষাটা করে দেখ। তুমি তো আনন্দ পাবেই, যে দেখবে সে-ও আনন্দ পাবে।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এ থাকবে

9টি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস

2টি বিজ্ঞান ও ইতিহাস নির্ভর প্রবন্ধ

10টি বিশেষ প্রবন্ধগুচ্ছ ঃ

6টি রঙিন ফিচার

2টি দীর্ঘ চিত্র কাহিনী

2টি অনুবাদ গল্প

5টি মডেল ঃ নিজে নিজে কর

10টি সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস

5টি জীবন চরিত

3টি নির্বাচিত প্রবন্ধ

5টি প্রতিযোগিতা

এ ছাড়া অসংখ্য ছড়া, কবিতা, কার্টুন, কমিকস ও অন্যান্য আকর্ষণ

তোমার কপির জন্য এখনই হকার ও কাগজওয়ালাকে বলে রাখো

সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ডায়েরী ⁹জুলাই বিমান বসু

2 জুলাই 1900 ঃ এই দিন জার্মানীতে বায়ুর চেয়ে হাল্কা প্রথম বিমানপোত (airship) 'জেপেলিন-1' (Zeppelin-1) আকাশে ওড়ে। এ ধরনের বিমানপোতে আজকের এরোপ্লেনের মত ডানা ছিল না। অ্যালুমিনিয়ম পাতের তৈরি কাঠামোর ওপর বিশেষ ধরনের প্রলেপ লাগানো কাপড় মোড়া বিশাল খোলের ভেতরে ভরা হোত হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি থলে। হাইড্রোজেন হাওয়ার চেয়ে হাল্কা হওয়ার দরুন ঐ বিশাল গ্যাস ভরা বিমানপোত অনায়াসে আকাশে ভাসতে পারতো। সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাতে লাগানো থাকতো এরোপ্লেনের মতই পেট্রল ইঞ্জিন চালিত প্রপেলার, তবে তা ছিল খুবই কম শক্তিশালী।

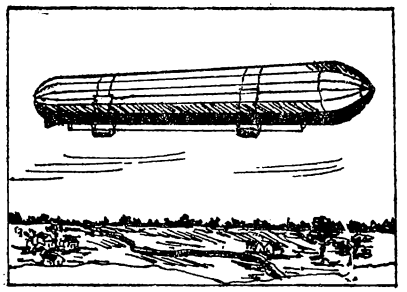

জেপেলিন

জেপেলিন-1 বিমানপোতটি ছিল 420 ফুট লম্বা, তাতে লাগতো 4 লক্ষ ফুট ঘন হাইড্রোজেন। 1910 সালের পর জার্মানীতে ব্যবসায়িকভাবে বিভিন্ন শহরের মধ্যে যাত্রীবাহী জেপেলিন সেবা শুরু হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জেপেলিনের সাহায্যেই লণ্ডন শহরের ওপর প্রথম বোমা বর্ষণ করা হয়। 1930-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে নিয়মিত জেপেলিন সেবা চালানো হয়, কিন্তু 1937 সালে এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডে বিশ্বের বৃহত্তম জেপেলিন 804 ফুট লম্বা 'হিণ্ডেনবার্গ' (Hindenberg) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর জেপেলিনের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দুর্ঘটনায় 35 জনের মৃত্যু হয়।

2 জুলাই 1983 ঃ মাদ্রাজের কাছে কল্পাক্কম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি 235 মেগাওয়াট ইউনিটটি এই দিন চালু করা হয়।

7 জুলাই 1960 ঃ এই দিন আমেরিকায় পদার্থবিদ থিওডোর মাইম্যান (Theodore Maiman) লেসার (Laser) আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। লেসার শব্দটি তৈরি হয়েছে ইংরেজী বাক্য (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'-এর আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে। বাক্যটির বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম দাঁড়ায় ঃ "প্ররোচিত রশ্মি বিচ্ছুরণের দ্বারা আলোক পরিবর্ধন"। মাইম্যান যে লেসারটি তৈরি করেছিলেন তাতে বিশেষভাবে তৈরি চুনির স্ফটিকের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন আলোক তরঙ্গ পাঠানোর ফলে তা থেকে উজ্জ্বল লাল রং-এর শক্তিশালী ও সুসংহত আলোক রশ্মি বা 'লেসার রশ্মি' বেরিয়ে আসে। আজকাল অবশ্য স্ফটিকের পরিবর্তে গ্যাস ও তরল দ্রবণভিত্তিক লেসারও তৈরি হচ্ছে যাতে কোনও রং-এর লেসার রশ্মি উৎপন্ন করা সম্ভব।

লেসার রশ্মির প্রধান গুণ এই যে, সাধারণ আলোর মত এই রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, বহুদূর পর্যন্ত একই সমান্তরাল রেখায় চলে, ফলে বহু দূরেও এর শক্তি হ্রাস পায় না। তাছাড়া এত শক্তিশালী লেসার রশ্মি উৎপন্ন করা সম্ভব যা দিয়ে সহজেই ধাতু গলানো যায়, মোটা ধাতুর পাত কাটা যায়, এমন কি তা দিয়ে হীরের মত কঠিন বস্তুর মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করা যায়। তাছাড়া চিকিৎসাক্ষেত্রে ছুরির বদলে সূক্ষ্ম লেসার রশ্মি ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ ছাড়াই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক কালে যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে শক্তিশালী লেসার রশ্মির ব্যবহার নিয়ে কিছু দেশে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

9 জুলাই 1819 ঃ সেলাই মেশিনের আবিষ্কারক এলিয়াস হাউ (Elias Howe) এই দিন আমেরিকার স্পেনসার (Spencer) শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

11 জুলাই 1979 ঃ আমেরিকার মহাকাশ কেন্দ্র 'স্কাইল্যাব' এই দিন কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলের কাছে সমুদ্রে ভেঙে পড়ে।

16 জুলাই 1945 ঃ আমেরিকার নিউ মেক্সিকো রাজ্যের মরুভূমি অঞ্চলে আলামো গোরোডো (Alamogorodo)'তে এই দিন প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

17 জুলাই 1975 ঃ এই দিন সর্বপ্রথম মহাকাশে এক আন্তর্জাতিক মিলন ঘটে। অতলান্তিক মহাসাগরের প্রায় 225 কিলোমিটার ওপরে আমেরিকার অ্যাপোলো (Apollo) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সোয়ুজ (Soyuz) মহাকাশযানকে একত্রে জুড়ে দু'দেশের মহাকাশযাত্রী বিনিময় করা হয়। অ্যাপোলোর যাত্রী ছিলেন টমাস স্ট্যাফোর্ড (Thomas Stafford), ডন্যাল্ড স্লেটন (Donald Slayton) এবং ভ্যান্স ব্র্যান্ড (Vance Brand)। দু'জন সোভিয়েত মহাকাশ যাত্রী ছিলেন অ্যালেক্সি লিওনভ (Aleksey Leonov) ও ভ্যালেরি কুবাসভ (Valery Kubasov)। প্রায় দু'দিন ধরে সংযুক্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর দু'টি মহাকাশযান আবার যাত্রীসহ নিজ নিজ দেশে ফিরে আসে।

18 জুলাই 1980 ঃ এই দিন ভারতে তৈরি এস এল ভি-তিন (SLV-3) রকেট দিয়ে ভারতে তৈরি উপগ্রহ 'রোহিণী' কে সফলভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এর আগে 1979 সালের 10 আগস্টের প্রথম চেষ্টা বিফল হয়েছিল। 17টন ওজনের চার স্তর বিশিষ্ট এস এল ভি-তিন কঠিন জ্বালানী চালিত রকেট হওয়ার দরুন এর ক্ষমতা খুবই সীমিত। এর সাহায্যে কেবলমাত্র 40-45 কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহই কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব। এস এল ভি-তিন রকেটের সাহায্যে মোট তিনটি ভারতীয় রোহিণী উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, তাদের শেষেরটিকে ছাড়া হয়েছিল 1983 সালের 17 এপ্রিল তারিখে।

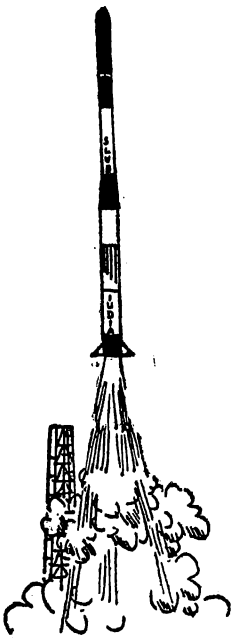

এস এল ভি-3

21 জুলাই 1969 ঃ এই দিন চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ পদার্পণ করে। তাঁর নাম নীল আর্মস্ট্রং (Niel Armstrong)। আরও দুজন মহাকাশচারী এডউইন অ্যালড্রিন (Edwin Aldrin) ও মাইকেল কলিন্স্ (Michael Collins)'এর সঙ্গে অ্যাপোলো-11 মহাকাশযানে চড়ে চাঁদের কক্ষপথে

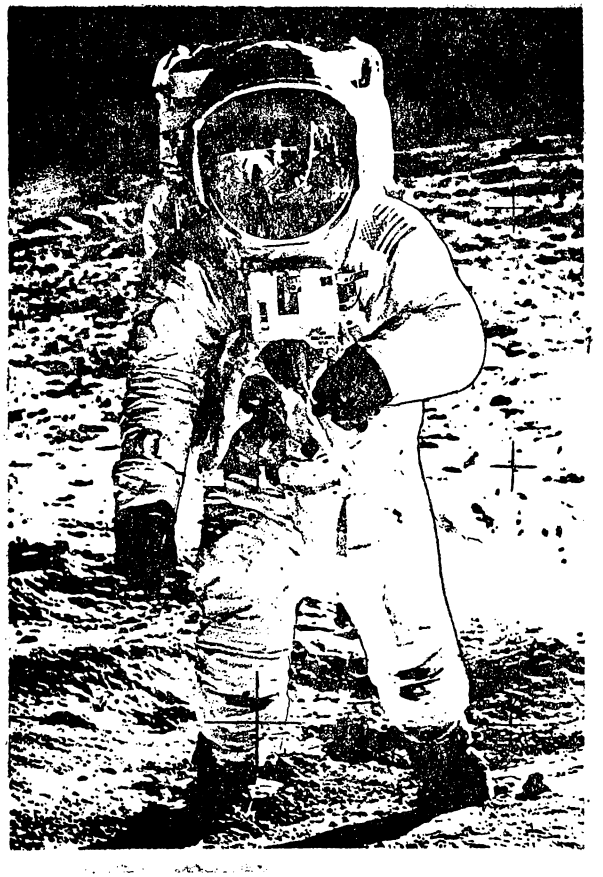

চাঁদের মাটিতে আর্মস্ট্রং

পৌঁছানোর পর 'ঈগল্' (Eagle) নামক চন্দ্রযানে (Lunar module) চড়ে আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন চাঁদের বুকে নেমে আসেন। অবতরণের প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টা পর চন্দ্রযানের দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চাঁদের মাটি স্পর্শ করেন আর্মস্ট্রং। ঐ সময় পৃথিবীতে পাঠানো তাঁর ঐতিহাসিক উক্তিটি ছিল ঃ "That's one small step for man, one giant leap for mankind"। এর বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম—মানুষের জন্য এটি একটি ছোট পদক্ষেপ হলেও মানবজাতির জন্য এ হলো এক বিরাট লাফ।"

21 জুলাই 1976 ঃ এই দিন প্রথম একটি মানবরহিত যান 'ভাইকিং-এক' (Viking-1) মঙ্গলগ্রহের Chryse Planitia এলাকায় অবতরণ করে। গ্রহের উপরিতল থেকে চারপাশের রঙীন ছবি তুলে পাঠানোর জন্য

বিশেষ ধরনের ক্যামেরা ছাড়াও, সেখানকার মাটি তুলে পরীক্ষা করার জন্য আবশ্যিক যন্ত্রপাতি

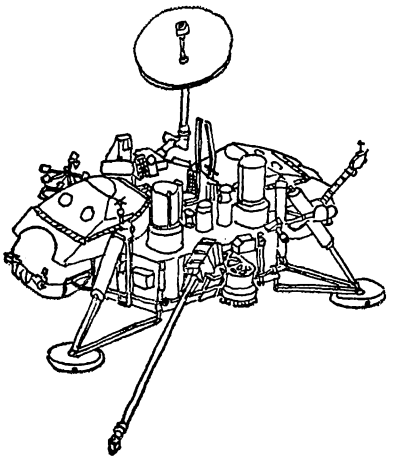

ভাইকিং 1

ভাইকিং যানে ছিল। ঐ সব পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলের মাটিতে জীবনের লক্ষণ আছে কি না তা খুঁজে বের করা। তবে ভাইকিং-1 এবং তার জুড়ি ভাইকিং-2 গ্রহযান থেকে সেখানকার মাটি তুলে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সত্ত্বেও জীবনের কোনও লক্ষণই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, মাটির ওপরে না পাওয়া গেলেও মাটির নীচে হয়ত নিম্নস্তরের জীবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

22 জুলাই 1822 ঃ বংশানুক্রম বিধি বা Laws of Heredity'র আবিষ্কারক গ্রিগর মেন্‌ডেল (Gregor Mendel) এই দিন আধুনিক

মেন্‌ডেল

পোল্যাণ্ডের (সে সময়কার জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত) Heinzendrof শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন এক খৃস্টীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন, সে সময় তাঁর বাগানে কড়াই-শুঁটির গাছ নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় তিনি দেখতে পান যে কড়াইশুঁটির ফুলের আকার, রং, দানার গঠন ইত্যাদিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার মধ্যে একটা বংশানুক্রমিক নিয়ম রয়েছে। তাঁর ঐ পরীক্ষার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত বংশানুক্রম বিধি আবিষ্কার করেন যা 1866 সালে প্রকাশিত হয়।

25 জুলাই 1978 ঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম 'টেস্টটিউব শিশু' লুসি ব্রাউন (Louise Brown) এই দিন ইংলণ্ডের ওল্ডহ্যাম (Oldham) শহরের এক হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে।

31 জুলাই 1971 ঃ এই দিন প্রথম মানুষ চাঁদের ওপর গাড়ি চালায়। অ্যাপোলো-15'তে চড়ে চাঁদে পৌঁছনোর পর দু'জন আমেরিকার মহাকাশচারী ডেভিড স্কট্‌ (David Scott) ও জেম্‌স্‌

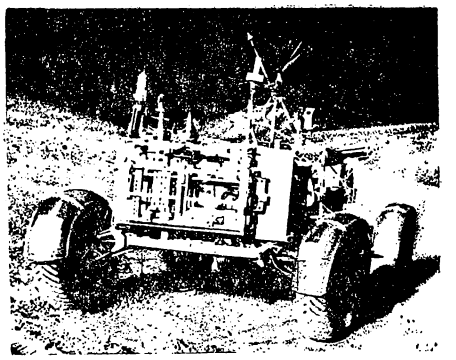

চাঁদের উপর Lunar Rover

আরউইন (James Irwin) ব্যাটারী চালিত চার চাকার গাড়ি Lunar Rover'এ চাঁদের মাটিতে 10 কিলোমিটার পথ ঘুরে আসেন। এরপর আরও দু'দিনে ঐ গাড়ি চড়ে এঁরা মোট 27 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন। এর আগেও অবশ্য চাঁদের বুকে গাড়ি চলেছিল। কিন্তু তা ছিল মানবরহিত গাড়ি, সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঠানো 'লুনোখদ' (Lunokhod)।

---

7 UF কলেজ রোড নিউদিল্লী-1

বিজ্ঞানের খবর

ভারতীয় রোবট

কলকারখানায় বড়সড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যেসব কাজ করতে হয়—যান্ত্রিক উপায়ে সেগুলি করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের এক রোবট তৈরি করেছেন বোম্বাই-এর একটি বেসরকারী সংস্থা। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায়—রোবটির ক্রিয়াকলাপ দেখান হয়েছে।

ইলেকট্রা-6 নামে এই যন্ত্রমানবের মস্তিষ্কের ভূমিকা পালন করছে একটি ছোট্ট কমপিউটার—যার কাজ হল প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলিকে নিজের স্মৃতিতে সাজিয়ে নেওয়া এবং পরে সেইসব নির্দেশ অনুযায়ী রোবটটি যাতে প্রয়োজনীয় কাজগুলি পর পর করে যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা।

মহারাষ্ট্রের রোবট প্রস্তুতকারক সংস্থাটির দাবী—এই যন্ত্রমানব তৈরির ব্যাপারে যা বতীয় কলাকৌশল উদ্ভাবনের কৃতিত্ব নাকি ভারতীয় বিজ্ঞানীদেরই প্রাপ্য। আপাততঃ এতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশের 40 শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে এ জাতীয় রোবট যে দামে বিকোয় তার তুলনায় আমাদের দেশে এগুলি তৈরিতে খরচ পড়ছে অনেক কম।

শীত ঘুম পাড়ানী

মস্কোর ফার্মাকোলজি ইন্সটিট্যুটে এমন এক কারিগরী কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে মানুষের মত উষ্ণ রক্তের প্রাণীকেও হাইবারনেশন বা শীত ঘুম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া চলে। এটি করার জন্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীটির শরীরের তাপ প্রবাহকে স্তিমিত করা হয় অথবা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে, প্রাণীদের শরীরে রোগজীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকটা কমে।

উষ্ণ রক্তের প্রাণীকে শীত ঘুমের জীবন্মৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের উৎসাহের একটা বড় কারণ—এইরকম অবস্থায় শরীরের বিপাকক্রিয়া খুবই স্তিমিত হয়ে আসে; শরীরের কলকব্জাগুলিকে চালু রাখতে অক্সিজেন ও শক্তির খরচ হয় যৎসামান্য। সেদিক থেকে দেখলে, এই নতুন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে মরণাপন্ন রোগীর শরীরের বিপাকক্রিয়া বেশ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিনের জন্য যদি স্তিমিত করা যায়—সেই রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান খানিকটা সময় ডাক্তারদের হাতে আসে।

স্বর্ণকেশরী বাঁদর

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের উদ্যোগে 12টি স্বর্ণকেশরী বাঁদর—যাদের পোষাকী নাম Lion Tamarins—দীর্ঘ তিন বছর পর জাপান থেকে স্বদেশ ব্রেজিলে ফিরল সম্প্রতি।

গত 1983 সালে গায়না থেকে জাপানে ঐ ট্যামারিনগুলো আমদানী করা হয়েছিল বিশেষ কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরে দেখা গেল—এদের পারমিট ছিল জাল, এবং মোটা টাকার লোভে কিছু অসৎ পশু ব্যবসায়ী এই কাণ্ড করেছিল। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার—এখন সারা দুনিয়ায় শুধুমাত্র পূর্ব ব্রেজিলের জঙ্গলে এই স্বর্ণকেশরী বাঁদরদের দেখা মেলে, এবং এদের সংখ্যা 400'র বেশি নয়। ব্রেজিলের বাঁদর জাপানে চোরাচালানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড রীতিমত আইনের আশ্রয় নিয়ে এমন চুক্তি সম্পাদন করিয়েছেন যার ফলে যেসব প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হতে বসেছে—বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাদের ব্যবসায়িক বিনিময় পুরোপুরি বন্ধ। সুখের কথা—যে সব দেশ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাপান ও ব্রেজিলও আছে।

জাপান-ফেরৎ ঐ বিতর্কিত বাঁদরগুলি এখন রয়েছে ব্রেজিলের সাও-পাওলোর এক প্রাকৃতিক পরিবেশের চিড়িয়াখানায়। এদের প্রজননের বিষয়টা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে—আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এদের সংখ্যা বাড়িয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়া যায় পূর্ব ব্রেজিলের অরণ্য ভূমিতে।

হাতিদের কথাবার্তা

অ্যাদ্দিন জানা ছিল, সাগর মহাসাগরের তিমি'রা পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যাপারে নিচু কম্পাঙ্কের শব্দের আদান প্রদান করে থাকে। এই ক্ষমতাটি যে হাতিরাও আয়ত্ত করেছে—সে তথ্য জানা গেছে হালে। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নিচু কম্পাঙ্কের হাতির ডাক সম্প্রতি রেকর্ড করেছেন।

অমিত চক্রবর্তী

বিজ্ঞান বিভাগ—আকাশবাণী, কল-1

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN6 th Yr Vol –12· APRIL –1987/Regd.No.WBEC/255

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

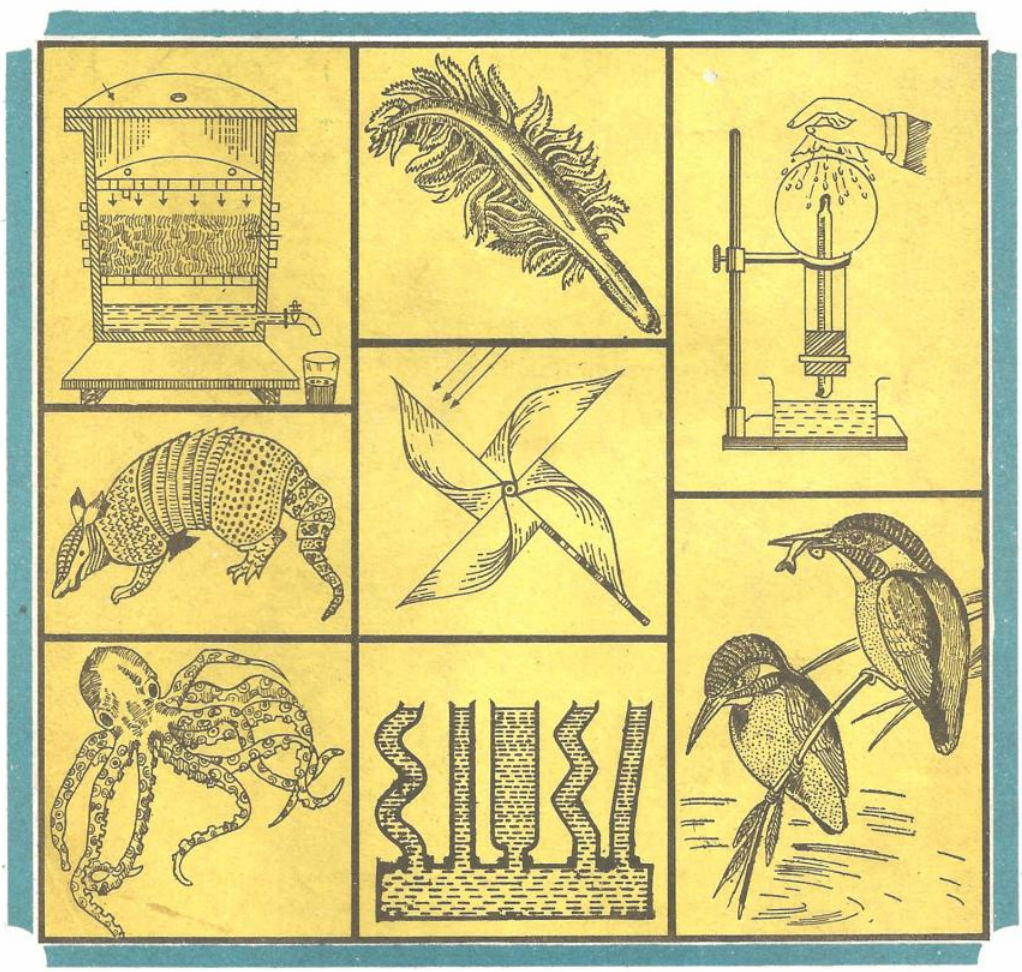

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং 8A, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-12।

দাম ঃ 4·00 টাকা।